রাধারানী দেবীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

সম্পাদনা :

জগদীশ ভট্টাচার্য

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস ভারবি। মুদ্রক শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২


Ranjan '80

প্রাক্-কথন

রাধারানী দেবীর আশি বছরের জন্মোৎসব উপলক্ষে অপরাজিতা রচনাবলী প্রকাশ করেছিলাম। ১৯৮৬-তে সেই বইটি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার'-এ সম্মানিত হয়। কিন্তু রাধারানী দেবীর কবিতা পাঠকের হাতে আসে না বহুকাল। 'ভারবি'র উৎসাহে ১৯৩৭-এর পরে, ২০০২-তে রাধারানী দেবীর কবিতার বই আবার প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমান সংগ্রহে রাধারানী ও অপরাজিতা দুই কবিরই কবিতা রইল। যেহেতু তিনি শুধু দুটি ভিন্ন নামই নয়, দুটি বিভিন্ন কাব্য-চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তাই লেখাগুলিও পৃথক গুচ্ছে সন্নিবিষ্ট হল।

আমার পিতৃবন্ধু এবং মায়ের প্রিয় দেবর, আমার পূজনীয় কাকাবাবু অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সস্নেহে এবং স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থের প্রাথমিক চয়নকর্মটি সমাধা করে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞ করেছেন। আমি তাঁর চয়নে হস্তক্ষেপের দুর্বিনয় করিনি, কেবল আরও কয়েকটি কবিতা যোগ করা ছাড়া। একটি অগ্রন্থিত কবিতাও রইল। সেটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমতী হৃষিতা বক্সী।

১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪-এর মধ্যে রাধারানী দেবীর তিনটি ও অপরাজিতার চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তখন তরুণ কবি, এবং কবিতা-প্রেমিক। কবিতাগুলির সমসাময়িক পাঠক, সহৃদয় ভক্ত ছিলেন তিনি। এমনকি পরে অপরাজিতারই অনুসরণে তাঁর 'কলেজ বয়' কবিতার সিরিজ রচনা করেছেন। এই সকল কারণে আমি কাকাবাবুর চয়নকে যারপরনাই মূল্যবান মনে করি। আমরা অনেক পরের যুগের পাঠক। অন্য দৃষ্টিতে রাধারানী দেবীর কবিতাগুলি পড়েছি। 'সিঁথি-মৌর' ও 'বনবিহগী' প্রকাশের প্রায় চল্লিশবছর পরে রাধারানী দেবী তাঁর নিজের ব্যবহৃত কপিতে কিছু সংশোধন শুরু করেছিলেন। বর্তমান সংকলনে পাদটীকায় তাদের পূর্বরূপের উল্লেখ করে কবির সংশোধিত পাঠই গৃহীত হল। 'মিলনের মন্ত্রমালা' তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ। বৈদিক বিবাহের কিছু মন্ত্র বেছে নিয়ে বাংলায় কাব্যানুবাদ করেছিলেন রাধারানী দেবী। এই বইতে তাঁর সেই কাজটির পরিচয় নেই, শুধুই মৌলিক কবিতা রয়েছে।

রাধারানী ও অপরাজিতা পৃথক ভাবে সংকলিত হলেন। কেননা কবি স্বয়ং দুটি ব্যক্তিত্বকে সযত্নে আলাদা রেখেছিলেন শুধু কাব্যলক্ষণেই নয়, হস্তাক্ষরে পর্যন্ত। সেই হস্তলিপি এতই আলাদা, যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অপরাজিতাকে উৎসাহ দিয়ে একের-পর-এক পত্র লিখেছেন রাধারানীর ঠিকানায়।

গত দু-বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যা-বিভাগের প্রয়াসে রাধারানী দেবীর গদ্যসংগ্রহ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এবছরে তাঁর কাব্যসংকলন প্রকাশ করে 'ভারবি' একটি অভাব মোচন করলেন। আশাকরি, বাংলা সাহিত্যের পাঠক-গবেষকদের কাজে লাগবে। শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আমার সৌভাগ্য এই বইতে তাঁর স্পর্শ রইল।

"ভালো-বাসা"
২৯শে পৌষ
১৪০৮

নবনীতা দেব সেন

ভূমিকা

১

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল মহিলা-কবির নাম রাধারানী দেবী। কলকাতার এক সম্পন্ন বনেদী ঘরে রাধারানীর জন্ম। পিতামহ পঞ্চানন ঘোষ ছিলেন সেকালের একজন নামকরা মুৎসুদ্দি। তাঁর নামে বাদুড়বাগানের গলিটি বিখ্যাত। পিতা আশুতোষ ছিলেন কোচবিহার রাজ্যের শাসনবিভাগের কর্তা। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবার রাধারানীর মাতুল-বংশ। কোচবিহারে পিতার কর্মস্থলে ১৩১০ বাংলার ১৪ অগ্রহায়ণ রাধারানীর জন্ম। ইংরেজি ১৯০৩ সালের ৩০ নভেম্বর। রাধারানীর শৈশব কেটেছে কোচবিহারে। পিতা ছিলেন কেশবচন্দ্রের অদীক্ষিত শিষ্য। রবীন্দ্রনাথেরও অনুরক্ত ভক্ত। আচার-আচরণে অত্যন্ত রাশভারি লোক। পারিবারিক সংস্কৃতিতে ধর্মনিষ্ঠা এবং সাহিত্যপ্রাণতার রাখীবন্ধন হয়েছিল। সেকালের প্রচলিত সমস্ত সাময়িকপত্র রাখা হত। পিতার অনুপ্রেরণাতেই পুত্র-কন্যারা পারিবারিক মাসিক পত্রিকা 'সুপথ' হাতে লিখে বের করতেন। সুপথেই রাধারানীর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স দশ বছর।

১৩২৪ সালে তেরো বছর বয়স পেরিয়ে রাধারানীর বিবাহ হয়। স্বামী ছিলেন ভবানীপুরের সম্ভ্রান্ত দত্ত-বংশের কৃতী সন্তান। মধ্যভারতের এক স্বাধীন রাজ্যে কাজ করতেন। বিবাহ উপলক্ষে মাত্র আটদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন। বিবাহান্তে বালিকা-পত্নীকে কলকাতায় রেখে কর্মস্থানে ফিরে যান। মাস তিনেক পরে সেই সুদূরপ্রবাসে সামান্য অসুখে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে প্রতিকূল দৈবের এই নির্মম আঘাত বুকে নিয়ে রাধারানী সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য পিতামাতা এবং অগ্রজগণের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শ্বশুর পবিবারও এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা বালিকা-বধূর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য আন্তরিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পুনর্বিবাহের প্রতি কবি-কিশোরী কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি। রবির আলোয় তাঁর চিৎকমল বিকশিত হয়েছিল। বাগ্‌দেবীর আরাধনাই হল তাঁর জীবনের ব্রত। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে, ১৩৩০ সাল থেকেই ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণীতে তরুণী কবি রাধারানী দত্তর কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল।

এই কাব্য-প্রকাশের সূত্রেই কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারানী দত্ত-র অন্তরঙ্গতা ঘটে। নরেন্দ্র দেব ঠনঠনিয়ার দেব-বংশের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাব

আলিবর্দী খাঁ-র দেওয়ান। নরেন্দ্র দেবের জন্ম ১৮৮৮ সালে। সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতী-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যেই তাঁর যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। 'কল্লোল' যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। কবি ও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তি সাহিত্যিক-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে।

নরেন্দ্র দেব ছিলেন রাধারানী দত্তর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। বয়সে পনেরো বছরের বড়ো। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই প্রতিভাশালিনী আত্মীয়াটিকে সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বভাবে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর স্নেহকৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কল্লোল-কালিকলমে উভয়েরই লেখা প্রকাশিত হতে লাগল—প্রেমের কবিতা ও গল্প। আত্মীয়তা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরঙ্গতা পরিজন-মহলে বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি করল। রাধারানী দুরন্ত হাঁপানি রোগে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তাঁর যথাযথ শুশ্রূষার অসুবিধা ঘটতে লাগল। সামাজিক কলগুঞ্জনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য নরেন্দ্র দেব বিবাহের প্রস্তাব করলেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিবাহে সামাজিক কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু দেব-পরিবার সম্বন্ধে রাধারানীর পিতা আশুতোষ ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। বাইরের প্রতিকূলতায় রাধারানী নিজের অন্তরের দিকে ফিরে তাকালেন। শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায় সাহিত্যিক-সমপ্রাণতায় তিলে-তিলে যে পরম অনুরক্তি গড়ে উঠেছে তার নির্দেশই তিনি মেনে নিলেন। ১৯৩১ সালের একত্রিশে মে দুই কবি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের সময় নরেন্দ্রদেবের বয়স তেতাল্লিশ; রাধারানীর আটাশ। বাংলার সারস্বত সমাজ এই বিবাহকে স্বাগত জানাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেবদম্পতিকে আশীর্বাদে অভিনন্দিত করলেন। বিবাহের এক বছর পরে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হল। শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিনেই সে মায়ের কোল শূন্য করে চলে যায়! কয়েক বছর পরে কবি-দম্পতি একটি কন্যারত্ন লাভ করেন—কবিগুরুই তার নামকরণ করেন, নবনীতা।

বাংলার সহৃদয় কাব্যরসিক-সমাজ দেবদম্পতিকে 'বাংলার ব্রাউনিঙ দম্পতি' বলে সম্মানিত করেছেন। ইংরেজ-সমাজে ব্রাউনিঙ-দম্পতির প্রেমনিষ্ঠা সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলার কবি-দম্পতিও তাঁদের চারুশীলিত জীবনচর্যায় বিদগ্ধ রসিক সমাজের ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (১৮১২-১৮৮৯) এবং এলিজাবেথ ব্যারেটের (১৮০৬-১৮৬১) সঙ্গে বাংলার কবি-দম্পতির জীবনের যেন আরও কিছু সাদৃশ্য আছে। এলিজাবেথ ব্যারেট অবশ্য রবার্ট থেকে বয়সে ছ-বছরের বড়ো ছিলেন। সেক্ষেত্রে রাধারানী নরেন্দ্র দেবের পনেরো বছরের ছোটো। উভয় ক্ষেত্রেই হৃদয়ের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে সাহিত্য-জীবনের সমপ্রাণতা থেকে। রবার্ট তেত্রিশ বছর বয়সে ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এলিজাবেথের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালের একুশে মে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয়। রবার্ট ও এলিজাবেথের এই প্রেমকে 'one of the most romantic of literary love stories' বলা হয়ে থাকে। এলিজাবেথ বয়সে শুধু ব্রাউনিঙের থেকে বড়োই ছিলেন না, ছেলেবেলায় মেরুদণ্ডে আঘাত লাগায়

তিনি চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সারাজীবন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়েই কাটাচ্ছিলেন। তাঁর গতিবিধি বিছানা থেকে সোফার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল। এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়েই এলিজাবেথ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রবার্ট তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এলিজাবেথের পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। পিতা এডওয়ার্ড ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদি পুরুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পঙ্গু এলিজাবেথ আজীবন কুমারীই থাকেন। কাজেই তিনি বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্ত হলেন। তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ রবার্টকে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরাগ গোপন করেই রাখতেন। অবশেষে রবার্টেরই জয় হল। প্রথম সাক্ষাতের ষোলো মাস পরে উভয়ে গোপনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এডওয়ার্ড কন্যার এই গোপন বিবাহের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। বিবাহের এক সপ্তাহ পরে এলিজাবেথ নীরবে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে গেলেন। সে-গৃহে তিনি আর কোনোদিনই ফিরে আসেননি। রবার্ট এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেলেন প্রেমের দেশ ইতালিতে। সেখানেই তাঁদের মিলিত জীবনের আনন্দময় বাকি দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। ইতালির আলো-হাওয়ায় এলিজাবেথ কিন্তু অনেকটা সেরে উঠেছিলেন। দু-বছর পরে পাঁচ মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারতেন। বিবাহের তিন বছর পরে কবি-দম্পতির একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিবাহের সময় এলিজাবেথের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন পনেরো বছরের। ১৮৬১ সালে এলিজাবেথ যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন; রবার্ট সবে পঞ্চাশে পড়েছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি ইতালি পরিত্যাগ করে ব্রিটেনে ফিরে আসেন। জীবনের বাকি আটাশ বছর বিপত্নীক কবি প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমের স্মৃতিকেই অন্তরে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। প্রেমের কবি হিসাবে ব্রাউনিং ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

পঙ্গু এলিজাবেথ যেমন রবার্টের প্রেমের স্পর্শে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, রাধারানী দেবীও তেমনি প্রেমের স্পর্শে শুধু দুরারোগ্য হাঁপানির প্রকোপ থেকেই নিষ্কৃতি পাননি, অভিশপ্ত জীবনের বন্দীদশা থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রেমই 'লীলাকমল'-এর কবির জন্ম দিয়েছে।

২

রাধারানী দেবীর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সাত। নিজের নামে তিনখানি :

লীলাকমল	১৩৩৬
সিঁথি-মৌর	১৩৩৯
বনবিহগী	১৩৩৯

'অপরাজিতা দেবী'র ছদ্মনামে চারখানি :

বুকের বীণা	১৩৩৭
আঙিনার ফুল	১৩৪০
পুরবাসিনী	১৩৪২
বিচিত্ররূপিণী	১৩৪৩

'লীলাকমল' রাধারানী দেবীর প্রথম গ্রন্থ। 'লীলাকমল'ই স্বনামে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 'কল্লোল-যুগ'-এ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন,

রাধারানী দেবী "কল্লোল"-এ লিখেছেন—'তিনি কল্লোল-যুগেরই কবি। ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে। তখনও তিনি দত্ত, দেবদত্ত হননি। এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাগৃহে আধুনিক সাহিত্যের যে বিচারসভা বসে তাতে ফরিয়াদী পক্ষে প্রথম বক্তা রাধারানী। সেদিনকার তাঁর সেই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়।' [কল্লোল-যুগ, চতুর্থ সং, পৃ. ১৫৪।]
এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে সহযাত্রী কবির কণ্ঠে রাধারানী দেবীর ব্যক্তিত্ব এবং কবিমানস সম্পর্কে দুটি সার্থক উক্তি উচ্চারিত হয়েছে। এক : 'সেদিনকার তাঁর সেই দার্ঢ্য এবং দীপ্তি ভোলবার নয়'। দুই : 'ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।'

অচিন্ত্যকুমার রাধারানী দেবীর ব্যক্তিত্বে দার্ঢ্য এবং দীপ্তির প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংসার-জীবনে গৃহবধূ হিসাবে রাধারানী বিনয়িনী, মঞ্জুভাষিণী। কিন্তু তাঁর সারস্বত ব্যক্তিত্ব যেমন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তেমনি প্রতিভার দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়। তিনি সে-যুগের সাহিত্যক্ষেত্রের তিন দিক্‌পালের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী। তাঁর ব্যক্তিত্ব একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরীকে আকৃষ্ট করেছিল—বাংলার সাহিত্য-সংসারের এ-সংবাদ ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর শেষ উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' অসমাপ্ত রেখেই ইহলীলা সংবরণ করেছিলেন। রাধারানী দেবীর ওপরই উপন্যাসখানি সমাপ্ত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। বাল্যকালে রাধারানীর লেখাপড়া বিদ্যালয়ে অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। কিন্তু তিনি সুশিক্ষিতা ছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বশিক্ষিত। রাধারানী মুখ্যত কবি। কিন্তু তিনি কয়েকটি ছোটোগল্পও রচনা করেছেন। সেগুলিতে তাঁর বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রবন্ধগুলি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধে উজ্জীবিত।

রাধারানী দেবীর কবিমানস সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্যটি ইঙ্গিতপূর্ণ : 'ইদানীন্তনকালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।' 'বিপ্লব' শব্দটি অবশ্য এখানে মুখ্য অভিধার্থে ব্যবহৃত হয়নি—গৌণ অর্থব্যাপ্তিতে তা প্রভূত ব্যঞ্জনাবহ।

আমরা বলেছি, রবির আলোতেই রাধারানীর মানস-কমল উন্মীলিত হয়েছে। বস্তুত, রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিভাষাকে যাঁরা নিজের আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে সার্থকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, রাধারানী দেবী তাঁদের অগ্রগণ্য।

রাধারানী দেবীর মানস-কমল যখন উন্মীলিত হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যৌবন। বলাকা-পূরবী-মহুয়ার কবি যৌবনের দীপ্তরাগে জ্বলদর্চি তনুতে উদ্ভাসিত হয়েছেন। কবি রাধারানী এই বলাকা-পূরবী-মহুয়ার কবির কাছে প্রতিবদ্ধচিত্ত। অভিসারিণী নির্ঝরিণীই তাঁর আত্মার প্রতীক। শুদ্ধান্তঃপুরের অবরোধে বন্দিনী নারীসত্তা

সারস্বত আকাশে প্রেমের আলোয় কি করে সমস্ত অবরোধ ভেঙে দিয়ে বন্ধনমুক্তির আনন্দে উদ্বেল হল, তারই ছন্দিত ইতিহাস 'লীলাকমল'-এর প্রতিটি রচনায় উদ্‌গীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আলো নারীচিত্তের বেদনার মেঘে-মেঘে যে ইন্দ্রধনু-বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে তারই নমুনা হিসাবে 'বিকাশ'-এর তৃতীয় স্তবকটি উদ্ধার করছি:

স্ফুরি সপ্তবর্ণচ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিল উচ্ছলি।
নিশার নিকষ-প্রান্তে প্রভাত সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ রূপ রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
রচি ইন্দ্রজাল,
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভরা-ভাদ্র-পূর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

এই 'নিমেষে উত্তাল' 'সিন্ধু'-স্রোতস্বিনীর দুর্বার অগ্রগতির ছন্দেই লীলাকমলের কবির হৃদয় উচ্ছ্বসিত।

রাধারানীর জন্ম অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দশীতে। 'লীলাকমল'-এর 'কালি শুক্লা বাসন্তিকা রাতে' কবিতায় কবি তাঁর নবজন্মের কথা শুনিয়েছেন :

কালি শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে
বকুল বীথিকাতলে
নব-শ্যাম-দূর্বাদলে
কুসুম ঝরিল মোর মাথে।
চুমিয়া ললাট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িল কটি বৃন্তখসা শিথিল-বকুল,—
অসহ-হরষ-রসে শান্ত-তনু তটিনী-দুকূল
প্লাবি এল বান।
বক্ষ-তটে হল শুরু
ঘন-কম্প দুরুদুরু
যৌবনের গান।

কবির জন্মলগ্নে হেমন্তের শুক্লা চতুর্দশী ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন। কবির নবজন্ম শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে। প্রেমের আলোয় জীবনের কুহেলিকা অপসারিত হয়েছে। সেদিন শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী বিগতনাথা তরুণীর লেখনীমুখে নবীন পূর্বরাগের বলিষ্ঠ গীতোচ্ছ্বাস বাংলার বিদগ্ধ রসিকসমাজকে বিস্মিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার কেন বলেছিলেন, 'বিপ্লব তাঁর কবিতায় আভাত হয়েছে'—এ-সব কবিতা পড়লে তার অর্থ বোধগম্য হয়। বস্তুত, এমন কুণ্ঠাহীন আত্মঘোষণা বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কোনো নারীকণ্ঠে শোনা যায়নি।

দুঃখ-কারা পরিত্যাগ করে আনন্দ-মন্দিরে যাওয়ার আহ্বান এল গোধূলি লগ্নের স্বপ্নে। গোধূলির রক্তরাগকে প্রিয়তম-প্রেরিত 'সিঁথার সিঁদুর' মনে হল তাঁর। সেই

অভিলষিত মিলনের কল্পনায় সমস্ত চেতনা মধুময় হয়ে উঠল। মনে জেগে উঠল, 'মিঠা লাজ'! বাঞ্ছিত বল্লভের বন্দনায় কলকণ্ঠী কপোতীর আনন্দ-কূজনে রুদ্ধগৃহ মুখরিত হল :

ওগো দূর-প্রিয়তম!
গোধূলির গায়ে দেছ কি পাঠায়ে সিঁথার সিঁদুর মম?
এতদিন পরে ক্ষণিকের তরে মোরে কি স্মরেছ বঁধু?
তাই সারা প্রাণ গেয়ে ওঠে গান মধু—মধু—সবি মধু।

৩

'লীলাকমল' গ্রন্থাকারে প্রকাশের বছর দুই পরে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারানীর বিবাহ হল। বিবাহের প্রথম বার্ষিকীতে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)—প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিঁথি-মৌর'। গ্রন্থখানি রাধারানী 'কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্'-কে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে আছে চৌদ্দো অক্ষর পয়ার-পংক্তির চৌত্রিশটি সনেট। দুই মিলের দুটি সংবৃত অথবা বিবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া অষ্টকবন্ধের পরে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। তারপর একটি সংবৃত চতুষ্ক। সনেট-পঞ্চাশৎ-এর কবি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রাধারানী দেবীর সান্নিধ্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'সীঁথি-মৌর' রচনায় তিনি একান্তভাবেই 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-পন্থী। একটি নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রথম সনেট :

প্রাণ-তীর্থ-যাত্রী মোরা গৃহ-উদাসীন—,
কলঙ্কের কলরোল ধ্বনিছে পশ্চাতে,
স্নেহশূন্য-স্বজনের গ্লানির সম্পাতে
আজি মোরা অখ্যাতির গৌরবে বিলীন।
সুন্দরের শঙ্খধ্বনি শুনেছি সেদিন,—
শৈল-শৃঙ্গ টলে যথা তরঙ্গ-সংঘাতে,—
সর্ব দ্বিধা বাধা লজ্জা ঠেলি দুই হাতে,—
সাড়া দিছি সে আহ্বানে ভয়-কুণ্ঠাহীন।

আনন্দ-পাথেয় লয়ে চলিয়াছি পথে,
কামনার গুরুভার নাহি মনোরথে.

যে-দেবতা ঊর্ধ্বে ডাকে মাটির মানবে,
কেমনে আসন তাঁর পাতি ধুলা পরে?
যে-প্রেম সংকীর্ণ প্রাণ দিল মুক্ত করে;—
সে-প্রেম কি মূঢ়তার বন্দী হয়ে রবে?

'সীঁথি-মৌর'-এর কবিতাগুলি অভিধাতেই নিগূঢ় অর্থবহ। কবির স্বগতভাষণ স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাগুলি যেন কবিমানসের কড়চা। বিবাহের প্রথম বৎসরের আনন্দিত দিনরাত্রির সাক্ষী এরা। সেদিন সার্থকতার তীর্থে পৌঁছোবার জন্য যে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল তার অলিখিত ইতিহাস এই সনেটগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে:

ফিরায়ে লয়েছে মুখ স্বজন সমাজ,
একেরে লভিতে সবে হারায়েছি আজ।

কেহ বা শাপিয়া কহে—'কেন মরিল না?
এত শিক্ষা-দীক্ষা তার এ-ই পরিণাম?'
ওদের ও-সব কথা নির্বিকারে শোনা
একান্ত কঠিন, জানি,—তবু ভাবিতাম—
জীবনে বরিলে ওরা কেন ভয় পায়?
সত্যেরে পূজিলে কেন লজ্জা মানে চিতে?
কাঁচের পুতুল হয়ে বাঁচিবারে চায় !!
ভুলেছে কি প্রাণধর্ম আছে পৃথিবীতে?'

'লীলাকমল'-এর কবি প্রেমের প্রশস্তি রচনা করে বলেছিলেন, 'পুঁথির মানুষ হয়ে রবো বেঁচে আর কতো কাল?' এখানে উপমান পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে, 'কাঁচের পুতুল।' চর্তুদশ সনেটে কবি বলেছেন, 'দৈত্য-মায়া-দণ্ড-ছোঁয়া দীর্ঘ-সুপ্তি-ঘোর' তাঁকে মৃতপ্রায় করে রেখেছিল—প্রেমের সোনার কাঠির অমৃত-স্পর্শে তিনি সঞ্জীবিত হয়েছেন .

যে ছিল পাতালপুরে চিরনিদ্রালীনা,
সে আজি আলোকরাজ্যে সিংহাসনাসীনা।

আমরা এলিজাবেথ ব্যারেট প্রসঙ্গে বলেছি, রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রেম তাঁর শারীরিক পঙ্গুদশা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। রাধারানী দেবীর জীবনেও একসঙ্গে এসেছিল মৃত্যু ও প্রেম। ২৪ সংখ্যক সনেটে সে ইতিহাস প্রথিত হয়ে রয়েছে। অসময়ে অকস্মাৎ তাঁর তনুতীরে মৃত্যুর তরণী এসে ভিড়েছিল। সে দিন নিঃশব্দচরণে প্রেমও এসেছিল তাঁর শিয়রে। কবিতার ষট্‌কবন্ধে মৃত্যু ও প্রেমের সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে :

আমার দক্ষিণ-পাণি তুলে নিল এসে
কালের ভৈরব-দূত; বাম পাণি তুমি—
ললাটে চুম্বন দিলে—দোঁহে ভালোবেসে;
তারপরে ...ডুবে গেল বিশ্ব-রঙ্গভূমি।

জাগিয়া চাহিয়া দেখি সে গিয়েছে ফিরে—
মৃত্যুজিৎ প্রেম একা আছে মোরে ঘিরে।

এই মৃত্যুজিৎ প্রেমই 'সীথি-মৌর' কাব্যগুচ্ছের আলম্বন।

৪

রাধারানী দেবীর তৃতীয় কাব্য-সংকলন 'বনবিহগী'। গ্রন্থখানি 'চিরতরুণ' কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে কবি বলেছেন, 'রবির আলোকে যে বিহগী পাখা মেলেছে তাকে রবিকরেই সমর্পণ করলাম।' কবিতাগুলি ১৩২৯ থেকে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত। অর্থাৎ কবির উনিশ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর বয়সের আনুপূর্বিক রচনাবলীর

নির্বাচিত সংকলন 'বনবিহগী'। কবিতাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা—মানসলোক ও মৃত্তিকালোক। মানসলোকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা, 'জীবনদেবতা'। এই কবিতার সঙ্গে 'লীলাকমল'-এর উৎসর্গ কবিতার একটি অলক্ষ্য যোগসূত্র রয়েছে। লীলাকমলের উৎসর্গ-কবিতায় কবি বলেছিলেন :

আমি যারে দিব অর্ঘ্যখানি,
তুমি তো সে-জন নহ, জানি।
আঁধারে করিয়া ভুল
এসেছিনু দিতে ফুল,—
সে ভুল কি নিতে হবে মানি?
সে-যে রাজ-অধিরাজ, যার এই অর্ঘ্য অমলিন
কেমনে মলিন করে এ পুষ্প স্পর্শিবে তুমি, দীন!

অর্থাৎ জীবনদেবতার উদ্দেশে যে অর্ঘ্য নিবেদিত, মর্ত্যের সামান্য দীন মানুষ কি করে তাকে স্পর্শ করবে? বিবাহের বৎসর দুই পূর্বে লেখা এই উৎসর্গ রচনার দিনে প্রেমের দেবতার মুখে নিশ্চয়ই কৌতুক-হাসি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। আদর্শবাদিনীর এই অহমিকা নম্র হল সর্বসমর্পণ করা আত্মনিবেদনের মহিমায়। কবি বুঝতে পারলেন, প্রেমের স্পর্শে সামান্যই অসামান্য হয়ে ওঠে। মানুষের দেহেই দেবত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাই তিনি বললেন,

দুঃখের দুঃসহ হোমানল,
যে-প্রেমেরে করে সমুজ্জ্বল,
যে-প্রেম ত্যাগের পরে
আসন রচনা করে
জীবনে যা ধ্রুব অচঞ্চল!
জাগে যদি সেই প্রীতি মৃত্তিকার মানবেরে ঘিরি,—
তুচ্ছ করি ফিরায়ো না,—জীবনদেবতা যাবে ফিরি।

'বনবিহগী'র এই উপলব্ধিতেই 'লীলাকমল'-এর ছদ্ম প্রত্যাখ্যানের অপরাধ প্রক্ষালিত হয়েছে।

'বনবিহগী'র 'মৃত্তিকালোক'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মৌন প্রশস্তি'। রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হলে ১৯৩১ সালে যে জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সেই উপলক্ষেই কবিতাটি লেখা। এ উৎসবে 'প্রকৃতির অন্তর্যামী' কবিকে নীরব কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে বিশ্বপ্রকৃতি। এসেছে প্রভাতসংগীত-এর নির্ঝরিণী, এসেছে কবির যৌবনদিনের পদ্মা, এসেছে গ্রাম্য বেণুকুঞ্জ, বর্ষার নদীতট, ছায়াঘন বৃদ্ধ বট, স্বচ্ছ পল্লী, দীঘি। এসেছে ফাল্গুনের আম্রবন, নিকুঞ্জের পুষ্পরাজি। এদের সবার সঙ্গে কবি নিজের পূজা-উপচার নিবেদন করে বলছেন,

আমি মনে ভাবি তাই তব যোগ্য পূজা-উপচার
কী দিয়া রচিব নাহি জানি!
আকাশ-বাতাস আলো শ্যাম ধরা যাঁর অর্ঘ্যভার
পদপ্রান্তে বহি দিল আনি।

এই অভিনব প্রশস্তিগাথা রবীন্দ্রকাব্যলোকে অনুবিষ্ট কবিভক্তের রাগানুগা ভক্তির সার্থক নিদর্শন।

'বনবিহগী'র সর্বশেষ কবিতার নাম 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' এই কবিতায় মৃত্যুজিৎ প্রেমের জয়ধ্বনি পুনর্বার উচ্চারণ করেই কবিকণ্ঠ নীরব হয়েছে। কবিতার অন্তিম স্তবকটি যেন কবির জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির মন্ত্র :

জীবন-যজ্ঞাগ্নি মোর ম্লান যেন নাহি হয় কভু,
এই শুধু চাই,
নিভুক বাহিরে দীপ, অন্তরের দিব্যালোকে তবু
কোনো দৈন্য নাই।
প্রাণের অমৃত দিয়া মৃত্যুরে করিব আমি জয়
মর-ধরণীতে,
প্রেমের দুর্লভ স্বর্গে রবো নিত্য অজর-অক্ষয়
ভাষাহীন গীতে।

প্রকৃতপক্ষে 'বনবিহগী'র পরে কবির স্বনামে আর কোনো কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়নি। এ-দিক দিয়ে এই কবিতাটি যেন দৈববাণীর মর্যাদা বহন করছে।

৫

নিজের নামে আর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ না করে রাধারানী দেবী 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতে লাগলেন। অপরাজিতার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বুকের বীণা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ সালে। কবিতাগুলি তার কিছুদিন আগে থেকেই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যের আঙিনায় অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নারীর কলমে অমন দুঃসাহসিকতা যেন কল্পনারও অতীত ছিল। অপরাজিতার কবিতা বাংলার রসিক-সমাজকে মৌতাতে বিভোর করে রাখল। 'বুকের বীণা' উপহার পেয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অজ্ঞাতপরিচয় কবিকে প্রথম যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা সমগ্রভাবেই উদ্ধার করছি—

কল্যাণীয়াসু,

তোমার কবিতাগুলি পড়ে দেখলুম। ভালো লাগল। তোমার রচনার ভাষা ও ভঙ্গী তোমার স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করেছে, অথচ তার স্খলন হয়নি। আমার কেবল একটা কথা বলবার আছে। এইরকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাইটি ভার্সেস। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প। চলমান স্রোতের উপর যে রঙীন ছায়া আকাশের চলমান মেঘের অনুবর্তন করে ভেসে চলে যায়, কোনো চিহ্ন রাখে না এবং তলায় গিয়ে পৌঁছোয় না, এও সেইরকম। নিকুঞ্জে পাখিও আছে রঙীন পাখার পতঙ্গমও আছে—কিন্তু যদি কেবল পতঙ্গম থাকে পাখিও না থাকে তাহলে অভাব থেকে যায়। তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখির গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে, তাদের কথায় কান দিয়ো না। তাদের মন অশুচি। কাব্যরচনা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার মতো কোনো অপরাধ তুমি

করোনি। লেখবার যে সহজশক্তি তোমার আছে তা নিয়ে তুমি গৌরব করতে পারো।'

১৩৩৮ সালের ২৯ বৈশাখে লেখা এই পত্রখানি লিখে কবির মন পরিতৃপ্ত হয়নি। নিজের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করবার জন্য তিনি ১৩৩৯ সালের ১৮ কার্তিক অপরাজিতা দেবীকে দ্বিতীয়পত্র লেখেন। এই পত্রে কবি লিখেছেন,

'আমার মনে পড়ছে তোমার বইখানি যখন আমার হাতে এল, তখন সংযত-সতর্ক ভাষায় প্রশংসার একটুখানি আভাসমাত্র দিয়েছিলাম। যারা বিজ্ঞলোক, তারা হাতে রেখে কথা বলে। যদি সব কথা পুরোপুরি বলতুম তাহলে তোমার অহংকার হত। তুমি আমার সমব্যবসায়ী, সেই জন্যে তোমাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস হল না, কী জানি কোন্ দিন হয়তো বলে বসবে যে—থাক সে কথা।

'আমার বলবার ইচ্ছে ছিল, তোমার লেখার যে-ভঙ্গী, যে-রঙ্গ, যে-কটাক্ষ, হাসির কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা, বাংলা-সাহিত্যে আর-কারো কলমে সেটা এমন চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। দুষ্ট ঘোড়ার মতো ওর অবারিত চাল, অথচ খানা-ডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক-এক লাফে। কারো বলবার জো নেই তোমার হাসি আর কারো হাসির মতো, তোমার গলার সুর আর কারো সুরে সাধা।'

অপরাজিতার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আঙিনার ফুল' কবি-ঠাকুরদা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত। গ্রন্থখানি পেয়ে কবিগুরু লিখলেন,

'তোমার লেখনীর একটি স্বকীয় চেহারা আছে, তার ছবি আঁকা চলে। পাহাড়ে ছোটো নদীতে নতুন বর্ষার বান নামলে নুড়ি ঠেলে ঠেলে জলের ধারা যেমন কলকল করে টগবগ করে ছোটে, তেমনি তার কলভাষা, তার উচ্চহাসি, তার প্রাণের উদ্বেলতা। তোমার বাণীতে তোমার নিজের কণ্ঠস্বর খুবই সুস্পষ্ট।'

১৩৪০ সালের বিজয়া-দশমীতে লেখা এই পত্রের পরে অপরাজিতার শেষ দু-খানি কাব্যগ্রন্থ 'পুরবাসিনী' এবং 'বিচিত্ররূপিণী' প্রকাশিত হয়েছে। আত্মপরিচয় গোপন করবার জন্য কবি 'পুরবাসিনী'কে উৎসর্গ করলেন 'রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের করকমলে'। বই দুখানি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ৩০.৩.৩৭ তারিখে লিখছেন,

'তোমার নতুন দুখানি বই পেলুম। মেয়েদের সংসারের উপরিতলে যে আলোর ঝলক চমক খেলে, যে-সব ছায়ার আভাস ভেসে চলে যায়, তারই ধ্বনি ও ছবি আশ্চর্য সহজ নৈপুণ্যে তোমার রচনার মধ্যে লীলায়িত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই রঙ্গিমা ও ভঙ্গিমা অপূর্ব। তোমার ভাষার সঙ্গে তোমার লেখনীর পরিহাসকুশল সখীত্ব দেখে বিস্ময় লাগে।'

কবিগুরুর এই পত্রচতুষ্টয়ের ভাষা একটু তুলনামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর সপ্রশংস স্বীকৃতি নব-নব বিশেষণ রচনা করে এই অজানা কবিকে অভিনন্দিত করেছে। অপরাজিতা দেবীর সমস্ত রচনাই তাঁর অভিন্নহৃদয় বান্ধবী রাধারানী দেবীর হাত দিয়ে সাহিত্যসমাজে পরিবেশিত হত। রাধারানী দেবীই যে অপরাজিতা দেবী, এ-কথা রবীন্দ্রনাথও মর্ত্য থেকে বিদায় নেওয়ার আগে জেনে যেতে পারেননি।

১৩৪১ সালের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'নারী-প্রগতি' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে অপরাজিতা দেবী কবিকে তাঁরই ব্যবহৃত ছন্দে একটি উত্তর লিখে পাঠান। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতাটি তাবই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'আধুনিকা' নামে ১৩৪১ সালের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিগুরুর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অপরাজিতা দেবী আত্মপ্রকাশ করেননি। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের বছর তিনেক পরে লেখা কবির চিঠি (৩০/৩/৩৭) থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরাজিতা দেবীর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে রাধারানী দেবী 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের লেখককে যে পত্রখানি লেখেন তা অপরাজিতা-রহস্য-উন্মোচনের সহায়ক।

রাধারানী দেবী বলেছেন, 'অপরাজিতার ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম, দ্বাদশ বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে, ছদ্মনামে ও ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা করব, রচনা তার শক্তি ও উৎকর্ষের দ্বারা যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই আত্মপরীক্ষায় আমাকে বহু কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখ সইতে হয়েছে।'

রাধারানী দেবীর সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার দিন এল যখন রবীন্দ্রনাথকে জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে এলেন যে, অপরাজিতা মেয়ে নয়, পুরুষ। ক্রুদ্ধ কবি রাধারানী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও রাধারানী দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কবিকে বললেন, 'অপরাজিতা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এখন আত্মপ্রকাশ করার উপায় নেই তার। তবে অপরাজিতা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলেই সে আপনার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে।'

রাধারানী দেবীর এই আত্মগোপন-ক্ষমতা অসামান্য। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব থেকেই তিনি অপরাজিতা নামে কবিতা লিখতেন। হাতের লেখাও একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন। অপরাজিতার প্রথম গ্রন্থ 'বুকের বীণা' বিবাহের আগেই প্রকাশিত হয়। বিবাহের পরেও কিছুদিন নরেন্দ্র দেব জানতে পারেননি, তার স্ত্রী-ই অপরাজিতা দেবী। একদিন মধ্যরাত্রে পড়ার ঘরে স্ত্রীর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর টেবিলে দুই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা কবিতার খসড়া ও তার অনুলিপি দেখে প্রথম বুঝতে পারেন রাধারানীই অপরাজিতা। বিস্ময়ের বিষয়, নরেন্দ্র দেবও গৃহিণীর এই গোপন কথা কোনোদিন কাউকে প্রকাশ করেননি।

৬

রাধারানী দেবী রবীন্দ্রনাথের কাছে অপরাজিতার পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের বান্ধবী বলে। তিনি বলেছেন, 'আমি কবির কাছে সত্যিই বলেছি। আমি আজও বলব, অপরাজিতা দেবী ও রাধারানী দেবী বিভিন্ন সত্তা। অপরাজিতা দেবী রাধারানী দেবীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মাত্র। দেহ এক হলেও এরা দুজনে পৃথক। উভয়ের সত্তা বিভিন্ন।'

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। রাধারানী ও অপরাজিতা একই ব্যক্তিত্বের দুই বিভিন্ন দিক। বরং অপরাজিতা দেবীর রচনার মধ্যেই রাধারানীর সত্যকার কবি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রাধারানী রবীন্দ্রগোত্রের কবি, রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্যা। অপরাজিতা আপন স্বকীয়তায় অত্যুজ্জ্বল, অদ্বিতীয়া, অনন্যপরতন্ত্রা। একথা রবীন্দ্রনাথও বারবার স্বীকার করেছেন।

সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশাসনের ফলে মানুষের বাসনা ও ব্যবহারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য গড়ে ওঠে। কখনও-কখনও মানুষের বাইরের আচার-আচরণ তার অন্তরের অবদমিত বাসনার ঠিক বিপরীত কোটিতে গিয়ে উপনীত হয়। স্বামীভাগ্য-বঞ্চিতা কিশোরী রাধারানীর আচার-আচরণে সংযত নিয়মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখা দিয়েছিল। তারপর তাঁর অন্তরে প্রেমের দেবতার আসন প্রতিষ্ঠিত হল। বৈধব্যজীবনের আরোপিত জীবন-চর্যার সঙ্গে নিত্য-উপচীয়মান অনুরাগের সংগ্রাম শুরু হল তাঁর অন্তর্লোকে। এই আত্মসংগ্রামের কাব্যরূপ 'লীলাকমল' ও 'বুকের বীণা'। দু-খানিই পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভের কাব্য। লীলাকমল সমাজসচেতন কবির আত্মপ্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ কাব্যরূপ। বাইরের অবরোধ ভেঙে বিদ্রোহিণী নারী মুক্তির আলোয় নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজছে—লীলাকমলের কবিমানসের এই হল সত্য পরিচয়। 'বুকের বীণা'য় কবি নিজের নাম-পরিচয় দূরে সরিয়ে রেখে নবীন অনুরাগের স্বপ্নসম্ভোগে বিভোর হয়ে আছে। আলংকারিকগণ সঙ্গমপূর্ব রতিকেই বলেছেন পূর্বরাগ। পূর্বরাগে অঙ্গসঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু লীলাবিলাসের সমস্ত বাসনাই মনে-মনে আস্বাদিত হয়। অনাস্বাদিত মিলনের এই মনোময়ী বাসনাই স্বচ্ছন্দকাব্যরূপ পেয়েছে 'বুকের বীণা'য়। অন্তরে বাসনা জেগেছে, বাস্তব জীবনে তার পরিতৃপ্তির পথ অবরুদ্ধ—এই অতৃপ্ত বাসনার সুকুমার অনুভাবগুলি কুড়িয়েই 'বুকের বীণা' রচিত। জন্মদিনে কোন্ রঙের শাড়িখানি পড়লে প্রিয়তমের ভালো লাগবে, কলেজ বোর্ডিং-এ অনূঢ়া তরুণীদের কোন্ রসালোচনা সবচেয়ে রুচিকর, এ-সব কথা তো আছেই। সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দাম্পত্যজীবনের 'চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-লীলা'। নারীকে সমাজ চিরদিন নির্বাক করে রেখেছে বলেই, নারীজীবনের অন্তরঙ্গ কথাগুলিকে প্রগল্‌ভ বলেই মনে হয়। 'দিনের শুরু' কিংবা 'নিশীথ-কলহে' প্রভৃতি কবিতায় কবি বাঙালি-জীবনের যে ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন তার মাধুর্য অনস্বীকার্য। সবচেয়ে সার্থক এর বাগ্‌ভঙ্গি। অপরাজিতা দেবী প্রতিদিনের কথাবার্তার আটপৌরে ভাষাতেই তাঁর কবিতা রচনা করেছেন। নির্ভুল ছন্দে বার্তালাপের ভঙ্গিকে ক্ষুণ্ণ না করে এ-ধরনের কাব্যরচনা যে বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ তা মানতেই হবে। মুখের ভাষাকে 'বুকের বীণা'য় ফুটিয়ে তুলে অপরাজিতা দেবী বাংলা কাব্যলোকে নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। 'সিঁথি মৌর'-এর কবিতাগুলির সঙ্গে,

কলঙ্ক আজ চন্দন মোর, নিন্দা হয়েছে ফুল,
প্রাচীনসমাজে কুলায়নি ঠাঁই, ভেঙেছে স্বজন-কূল!—

—এই দুই পংক্তির আশ্চর্য মিল লক্ষ না করে পারা যায় না। 'বুকের বীণা' 'প্রিয়তম'কে উৎসর্গ করা। উৎসর্গ কবিতাটিতেও 'লীলাকমল'-এর কবিকণ্ঠকে চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয় :

জীবনের চেয়ে সত্য ত্রিলোকে কিছু নেই কোনোখানে,
তনু-মন-প্রাণ ভরে গেছে মোর আজি এ কবির গানে,
হৃদয়ের চেয়ে বড় নেই কিছু—দু-দিনের দুনিয়ায়
জনমের পিছু মরণের ডাক অহরহ শোনা যায়!
মূঢ় সমাজের বিধিনিষেধের বিপুল শাসন মিছে—
মানুষের প্রেম নিকষিত হেম—সে নহে কাহারও নীচে—
'—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

'মূঢ় সমাজের বিধিনিষেধের বিপুল শাসন' সাধারণ দাম্পত্যজীবনের বিরহ-মিলনের কবিতায় আসবার কথা নয়। এ যে একটি বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা বিশেষ মনের স্বপ্নকামনা—একথা বলাই বাহুল্য।

৭

অপরাজিতা দেবীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'আঙিনার ফুল'। 'ভূমিকা'য় আত্মপরিচয়ের ছল করে কবি বলেছেন,

গন্ধবিহীন দীন কালো ফুল,—
সভায় আমারে এনো না ডাকি।
প্রিয়বল্লভ-পল্লব ছায়ে
বেড়ার আড়ালে গোপনে থাকি।
রবির আলোয় চন্দ্র-কিরণে
ফোটে কত-শত রঙিন ফুল,—
আমি আঁধারের, আমাকে খুঁজিয়া
রসিক জনেরা কোরো না ভুল।

গূঢ়ার্থ প্রতীতিতে একে এক ধরনের অপহ্নুতি অলংকার বলা যেতে পারে। এই কাব্য প্রকাশের পূর্বে কবির বিবাহ হয়েছে। কাজেই 'প্রিয়বল্লভ-পল্লব ছায়ে বেড়ার আড়ালে গোপনে থাকা' বিশেষ অর্থবহ হয়েছে। তাছাড়া রাধারানী দেবী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সে-কথা চিন্তা করলে 'রবির আলোয় চন্দ্রকিরণে' কত শত রঙিন ফুলের ফুটে ওঠাও অর্থমণ্ডিত। এই 'কত-শত'দের মধ্যে কবি কেউ নন, তিনি আঁধারের—এই নিষেধোক্তির মধ্যেই নিশ্চয় প্রতীতি নিহিত আছে। এও এক ধরনের আলংকারিক Denial—তাই একে অপহ্নুতি অলংকারের সগোত্র বলে মনে করা যেতে পারে।

'আঙিনার ফুল'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'স্ক্যান্ডাল'। অভিজাত সমাজে এক ধরনের নারী আছে যারা সকলের কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। এই কুৎসা-রটন-পটীয়সী নারীটিকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কবি এই কবিতায় মূর্তিমতী করে তুলেছেন। এমন কি তার মুদ্রাদোষটুকুও বাদ যায়নি। তাই রসনারোচন কেচ্ছাগুলি শেষ করে সে যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলছে :

সন্ধ্যে কখন উৎরেছে?...ঈষ্। রাত্রি ঘনায় যে রে।
কথায়-কথায় হয়নি খেয়াল আর।...

...ষাট্ যদি না-ই পারিস নিদেন পঁচিশ টাকাই দে রে
মাসকাবারেই শোধ দেব তোর ধার!

বাংলা কাব্যে এই ধরনের চরিত্র আর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য 'বুকের বীণা'র মতোই 'আঙিনার ফুল'-এও দাম্পত্য জীবনের চটুলতার প্রতিই কবির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। 'বাসর ঘরে', 'রুদ্ধ গৃহে' প্রভৃতি কবিতাই তার প্রমাণ। কিন্তু ওরই ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ কখনও অপরাজিতার কণ্ঠে রাধারানীর ভাষা শুনতে পাওয়া গিয়েছে। 'আজ' কবিতাটিকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। শিলং পাহাড়ে আগের রাত থেকে বাদল নেমেছে, আকাশ হয়েছে মলিদা রঙের। কবি বলছেন,

বকুল-মালিকা কোনও মালবিকা দেয়নি আমায় এনে!
এলাই নি কেশ, এলো-খোঁপা শুধু নিজেই বেঁধেছি টেনে॥
ভালে নেই মোর অলকাতিলক, তনুতে পত্রলেখা,
ভবন-বলভি-শিখরে আমার নাচে না মত্ত কেকা॥
যূঁথীপরিমলে গৃহগুহা মোর মোটে নয় সুরভিত।
প্রবাসী প্রিয়ের বিরহ-দহনে গুমরি দহে না চিত॥

... ...

চিকন সবুজ পাহাড়ের গায়ে বৃষ্টিধারার চিক্
স্ফটিক-পর্দা দিয়েছে টাঙিয়ে দেখি চেয়ে অনিমিখ॥
শিখরে-শিখরে শুভ্র মেঘের চপল ঝুলন-মেলা।
শ্যামল-ভ্যালির স্নিগ্ধ বুকেতে শ্রাবণের লীলাখেলা॥
সুনীলকান্ত মণিনিভ মেঘ সুদূর শৈলশিরে,
দিয়েছে পরায়ে রঙিন কিরীট উন্নত চূড়া ঘিরে॥
সবুজের বুক চিরে চলে গেছে সিঁদুর-বর্ণ পথ—
নব-বিবাহিতা শ্যামা-রূপসীর রক্তিম সিঁথিবৎ॥

এই কবিতায় কবি আর আত্মগোপন করতে পারেননি—কেন না এ-ভাষা 'বুকের বীণা', 'আঙিনার ফুল'-এর কবিভাষা নয়; এর মধ্য দিয়ে 'লীলাকমল', 'বনবিহগী'র মঞ্জুভাষিণী কবির কণ্ঠই শোনা যাচ্ছে।

৮

অপরাজিতা দেবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পুরবাসিনী'। আমাদের গৃহকোণে গৃহিণী-সচিব-সখীরা তো আছেনই, আরও আছেন বৌদিদি-ননদিনী-মা-পিসিমা-মাসিমা-কাকিমা-জেঠিমা। ঠানদিদি আছেন, দিদির ছোটবোনেরাও আছে। শ্যালিকা-নাতনিদেরও অভাব নেই। এদের সবার টাইপ-চরিত্রগুলি এদেরই নিজের-নিজের ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা কম কঠিন কাজ নয়। এদের প্রত্যেকের মুখের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিকে বিন্দুমাত্র না বদলে নিখুঁত ছন্দে কবিতা লেখা আয়াসসাধ্য কবিকর্ম। এই কঠিন কবিকর্মে অপরাজিতা দেবী উত্তীর্ণ হয়েছেন—এ তাঁর অসামান্য লিপিকুশলতারই প্রমাণ। একে-একে এদের সঙ্গে পরিচয় করা যাক :

প্রিয়সখী :

এবারের ছুটিতে
তুমি নাকি উটিতে
যাচ্ছ বেড়াতে?...হ্যাঁ গো! সত্যি কি?—বলো না!—
আমি বলি তার চে
এপ্রিল-মার্চে
কাশ্মীরে এ বছর যাই কেন চল না!!—

সচিব :

খরচ কমানো হুজুগ উঠেছে দেশে—
তোমারও চাকরি যায় যদি এতে শেষে
যাবেই না হয়। চিন্তা কিসের অতো?
যতই ভাববে, বাড়বে ভাবনা ততো।

গৃহিণী :

বাইরে এসেছে বন্ধুরা ওঁর, চা পাঠিয়ে দিই,
নিম্‌কি ভাজি!
ডাকছেন উনি,—কেষ্টা নাই কি?
জিগেস করুক, তামাক চাই কি?
যাঃহ্! ভুলে গেছি!... নেমন্তন্ন জামাইকে করে
পাঠাই আজই!

পিসিমা :

ষাট্! ষাট্ ষাট!—ওকি করো বউ!
ছেলেকে বকো না সন্ধেবেলা!
কিছুই তো আহা করেনি বাছারা
মাঠে গিয়েছিল করতে খেলা!
'পোড়ার-মুখো' কি বলতে আছে গা?
মা-ষষ্ঠী হন রুষ্টু এতে!
গালাগালি দিলে—কেড়ে নেন ছেলে!—
ষষ্ঠিতলায় আঁচল পেতে
তোমাকে দিয়েছি মাদুলি কবচ,—
নিজে কাটিয়েছি মানত করে
তবে না বেঁচেছে ওই গুঁড়ো-কটা,
মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে শিবের দোরে।
কখনও এমন মা দেখিনি বাপু!
মরা-হাজা ওই তিনটে কণা,
যখন-তখন যা-তা গাল দেওয়া!!...
—অতো ভালো নয় গিন্নিপনা।।

মাসিমা :

ও কে? অমিয়েশ?...আয় বাবা, আয়!
—কেমন আছিস বল্!
থাক্-থাক্ ওরে!—পায়ে হাত নয়,—
হয়েছে।—ওপরে চল্!
এতদিন কেন আসিস্ নি অমু?
দেখিনি যে মাস চার।
বড়ো হয়ে বুঝি মাসিমাকে তোর
মনেই পড়ে না আর?

কাকিমা :

বড়ঠাকুরের আসার সময় হল,—
বড়দি!—তোমার সেলাই এখন তোলো!
—জলখাবারের জোগাড় কিছুই নাই।
চারটে তো প্রায় বেজেই গেছে—, তবু
এখনও আজ মন্টু-মানিক-নবু
ইস্কুলেতে রইল কেন ভাই?
আমি বলি, আনতে ওদের মহেশ চাকর যাক না!
বড়দি! তোমার ভাবনা কি নেই?—সেলাই এখন থাক না।

তাছাড়াও মা, জেঠাইমা, ঠানদি, বৌদি, ননদ, দিদি ও ছোটোবোন এবং আরও অনেকে আছেন। বাংলার ঘরোয়া জীবনে, বাঙালির সংসারে এঁরা চিরন্তনী। অন্তঃপুরের মেয়েমহলে তাঁতিনীদেরও নিত্যকালের আনাগোনা।

৯

অপরাজিতা দেবীর সর্বশেষ কাব্য-সংকলনের নাম, 'বিচিত্ররূপিণী'। 'পুরবাসিনী'তে নারীর পারিবারিক চেহারাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'বিচিত্ররূপিণী'তে কবি নারীর ভাবমূর্তিগুলি রসিকসমাজের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণ প্রেমিকা নায়িকার মানসিক অবস্থাভেদে তাদের অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। রসশাস্ত্রে নায়িকা-প্রকরণে উদাহরণের সাহায্যে এদের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে কবিগণ এইসব বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়েই প্রেমের পরম তীর্থে পৌঁছে দিয়েছেন। মধ্যযুগের সেই পরিবেশ আর নেই। কিন্তু নরনারীর চিত্তে সেই বৃন্দাবনলীলা আজও আছে, চিরদিনই থাকবে। আধুনিক জীবনে আধুনিক পরিবেশে অভিসারিকা-বাসকসজ্জিকা-প্রভৃতি নায়িকার কথা বলা হয়েছে 'বিচিত্ররূপিণী'তে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কবিতাগুলি বুঝি অলংকারশাস্ত্রে উদ্ধৃত উদাহরণেরই আধুনিক সংস্করণ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এগুলি অলংকার-শাস্ত্রসম্মত পদ্য নয়—বাস্তবজীবনসঞ্জাত কাব্য।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'অভিসারিকা'র নায়িকা গিয়েছে পুরীর সমুদ্রতীরে। নায়ক ব্রতবীর স্লিপ পাঠিয়েছে সন্ধ্যায় সমুদ্রতীর ধরে পশ্চিমে স্বর্গদ্বারের শেষসীমায় যেতে। অভিভাবিকারা মন্দিরে যাবেন, আরতি দেখে ফিরতে রাত হবে। এই সুযোগে নায়িকা বেরোবে অভিসারে। অপরাহ্ণে তার মনের অবস্থা :

মুক্তার টাপ্ বদ্‌লিয়ে কানে নিই পরে নীল ঝুমকো দুটি,
মভ্ রং শাড়ি? না এখানা থাক। স্কার্লেট-ক্রেপে চুমকি-বুটি
এখানিও নয়। সমুদ্রতীরে চলবার পথে পুরুষ-মেয়ে
শাড়ির বাহারে নজর জড়ালে তাকিয়ে কেবলই দেখবে চেয়ে।

তারপর পরিবেশের উপযুক্ত বেশে সজ্জিতা হয়ে নায়িকা বেরিয়ে পড়ল স্বর্গ-দ্বারের উদ্দেশে। মনের তাড়ায় একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছে। চেনা লোকের সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায়, এইজন্য সংকোচও আছে। কিন্তু ধনুকের তীরের মতো মনের গতিকেও একবার ছুঁড়ে দিলে আর তো ফেরানো যায় না। তাই সে এগিয়েই চলতে লাগল। আরেকটু এগোলেই ব্রতবীরের দেখা পাওয়া যাবে। কবিতাটির শেষের চারটি চরণে অভিসারিকার অন্তিম মনোভাবটি উচ্চারিত :

অন্ধকারেতে ঢেকে গেছে দিক্। প্রায় জনহীন তটের বালি,
ফস্‌ফরাসের আলোর ফিন্‌কি পদতলে দীপ জ্বালায় খালি!
বাইরে মত্ত সাগরের ঢেউ আছড়িয়ে পড়ে বালুর পরে,
আমারও বুকের ভিতরে সাগর অমনি উথালি-পাথালি করে।

বলাই বাহুল্য, এ-কবিতা অলংকারশাস্ত্রের উদাহরণ মাত্র নয়—এর-মধ্যে জীবনের ছন্দ, এমন-কি নায়িকার হৃৎস্পন্দনটি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিপ্রলব্ধা। নায়ক তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসছে। নায়িকা (এক্ষেত্রে স্বকীয়া) তিন বছর ধরে এই দিনটির জন্য দিন গুনেছে; আজ তার প্রতীক্ষা সার্থক হবে। সজ্জিত শয়নগৃহের সুচারু প্রসাধনটি নয়নাভিরাম :

ধবধবে সাদা দুধের ফেনার মতো
বিছানা পেতেছি জোড়া-খাট জুড়ে আজ,
সার্থক হবে সেলাই করেছি যত
কুশনে-কভারে-পর্দাতে কারুকাজ।
বেডশিটে দিছি ফুল তুলে কোণে-কোণে,
কেলি-কদম্ব-কমলকলির সাথে,
ড্রেনথ্রেড টেনে চারপাশে জালি বুনে,
এমব্রয়ডারি করেছি নিজের হাতে।
মাথার বালিশে মরালমিথুন আঁকা,
রেশমী-তোষকে বনবসন্ত ছবি;
—তিনটি বছর এ-দিনের আশে থাকা,—
আজ চোখে তাই রঙিন ঠেকছে সবি।

এই সজ্জা-রচনার মধ্যে নায়িকার মনের মিলন-বাসনাটি ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে স্ফুট হয়ে উঠেছে। বর্ণনাটি যেমন বাস্তব, ইঙ্গিতটিও তেমনি নিগূঢ় মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু এই প্রতীক্ষা সার্থক হল না। স্টেশন থেকে গাড়ি ফিরে এল দুঃসংবাদ বহন করে। নায়ক (এক্ষেত্রে স্বামী) বম্বেতে নেমে সেখানে আরো দিন-দশ-বারো থাকবেন স্থির করেছেন—কবে আসবেন চিঠি লিখে জানাবেন। এই অবস্থায় নায়িকার মনের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। এক মুহূর্তে তার সমস্ত জীবনটাই বিস্বাদ বোধ হয়। দুঃখ-অভিমানে-হতাশায়-বিরক্তিতে সবচেয়ে প্রিয়বস্তুও বিরস ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মনের এই অবস্থায় নায়িকা বলে,

পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে আসে কানে
রবি ঠাকুরের গীতালির গানখানা,
এমন খারাপ সুর আর কথা,—গানে
রবিবাবু দেন,—ছিল না-তো আগে জানা।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিণী রাধার কমনীয় তনুতে চন্দন আর চন্দ্রালোকও অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করেছিল; কোকিলালাপ হয়েছিল কর্কশতায় পূর্ণ। আধুনিক নাগরিকার বিরহ-জর্জর চিত্তে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের এই জীবনাশ্রয়ী সূক্ষ্ম কবিকর্মে অপরাজিতার কবিতা যুগসত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই এ যুগের বিরহ-মিলন-কথাকে নিত্যকালের সামগ্রী করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ অপরাজিতা দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর কবিতাগুলিকে ইংরেজি সোসাইটি ভার্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।' 'পুরবাসিনী' ও 'বিচিত্ররূপিণী'তে পৌঁছে অপরাজিতা দেবী শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে সাহিত্যের নিত্যকালের বস্তুকে সার্থক মিলনে মিলিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, 'নিকুঞ্জে পাখিও আছে, রঙিন পাখার পতঙ্গমও আছে—কিন্তু যদি কেবল পতঙ্গম থাকে তাহলে অভাব থেকে যায়। তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখির গানও শুনতে চাই।' রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন রাধারানী দেবীই অপরাজিতা দেবী, তাহলে নিশ্চয়ই এ-কথা বলতেন না। অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা', 'আঙিনার ফুল'-এ যদি প্রজাপতির পাখার লীলাই দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তার আগেই রাধারানী দেবীর 'লীলাকমল'-এ পাখির গানও শোনা গিয়েছে। তাছাড়া অপরাজিতা দেবীর কবিতায় শুধু প্রজাপতির পাখার রঙ-ই আছে, পাখির গান নেই, একথা 'পুরবাসিনী'-'বিচিত্ররূপিণী'তে অপ্রমাণিত হয়েছে।

১০

আমরা বলেছি, অপরাজিতা দেবীর রচনার মধ্যেই রাধারানী দেবীর সত্যকার কবি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রগোত্রের কবিসমাজে রাধারানী দেবী অনেকের মধ্যে একজন। কিন্তু অপরাজিতা দেবী বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়া। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন,

'ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা সেটা বাংলা সাহিত্যে আর কারো কলমে এমন সত্য হয়ে ওঠেনি। পাহাড়ে ছোটো নদীতে নতুন বর্ষার বান নামলে নুড়ি ঠেলে-ঠেলে জলের ধারা যেমন কলকল করে টগবগ করে ছোটে, তেমনি তার কলভাষা, তার উচ্চহাসি, তার প্রাণের উদ্বেলতা।'...'আমাদের সাহিত্যে এই রঙ্গিমা ও ভঙ্গিমা অপূর্ব।'

তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, 'লীলাকমল'-এ কবি যে-সম্ভাবনা নিয়ে বাংলা সহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা পূর্ণ-পরিণত সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। তাঁর সাতখানি কাব্যগ্রন্থ ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; কবির কাছে আমরা আর কোনো নতুন কাব্যগ্রন্থ পাইনি। রাধারানী দেবী একান্তভাবেই প্রেমের কবি। প্রেমের দেবতা প্রজাপতির দৌত্য করে থাকেন। কিন্তু দাম্পত্য-মিলনের আনন্দে তাঁর ঈর্ষার অন্ত থাকে না। বিপ্রলম্ভ-বিরহেই প্রেম নিত্যনবায়মান, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে সে মুমূর্ষু। প্রেমের কবি প্রিয়-বল্লভ-পল্লব-ছায়ায় পরম আশ্রয় পেয়েছেন বলেই বাংলা সাহিত্য তাঁকে হারিয়েছে।

তবু তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় অসংখ্য নারী ভিড় জমিয়েছে। তাদের মধ্যে তরুণীদের সংখ্যাই বেশি। মেঘদূতের কবি বলেছেন :

বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ঃ যৌবনাদন্যদস্তি।

বিত্তেশদের যৌবন ছাড়া অন্য বয়স নেই, আর প্রেমই যৌবনের ধর্ম। রাধারানী দেবীর কাব্যলোকেও যে-সব নারী ভিড় করেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তারা চিরযৌবনা। আর প্রেমই তাদের প্রাণের ধর্ম। তাই তারা নিত্য-নবীনা।

জগদীশ ভট্টাচার্য

সূ চি প ত্র

রাধারানী দেবীর কবিতা :

াাকমল (১৯২৯)

া-মৌর (১৯৩২)

অপরাজিতা দেবীর কবিতা

বুকের বীণা (১৯৩০)

আঙিনার ফুল (১৯৩৪)

পুরবাসিনী (১৯৩৫)

বিচিত্ররূপিণী (১৯৩৭)

হে অজ্ঞাত! একান্ত অচেনা!
আমার স্মরণে পড়িছে না,
তোমারে চেয়েছি কভু!—
সমুখ হইতে তবু
কেন তব ছায়া সরিছে না?...
বারম্বার কেন কর প্রসারিছ ব্যর্থ-আশা ভরে!
আমার অর্ঘ্যের ফুল,—এ যে মোর দেবতার তরে!

আমি যারে দিব অর্ঘ্যখানি,
তুমি তো সে জন নহ, জানি।
আঁধারে করিয়া ভুল
এসেছিনু দিতে ফুল,—
সে ভুল কি নিতে হবে মানি?
সে যে রাজ-অধিরাজ, যার এই অর্ঘ্য-অমলিন,
কেমনে মলিন করে এ পুষ্প স্পর্শিবে তুমি, দীন!

তুমি তো বুঝিয়াছিলে মনে ;
আমি অন্বেষিছি—অন্যজনে।
কেন কহ নাই খুলি
'আঁধারে এসেছ ভুলি
অপরিচিতের নিকেতনে!'
জীবনের পূর্ণ হাটে শূন্য হাতে যাব ফিরে,—তবু,—
সুন্দরের অর্ঘ্য মোর, সামান্যেরে অর্পিব না কভু!

*

আজো যার পাইনি উদ্দেশ,
তারে খোঁজা নাহি হোক্ শেষ!
আলোকে আঁধারে দূরে—
মানব-জীবন-পুরে
খুঁজি তার পদচিহ্ন-লেশ!

যুগে-যুগে কালে-কালে দিকে-দিকে জন্ম-জন্ম মোর,
সেই দেবতার খোঁজে হয়ে থাক্ একান্ত-বিভোর!

জানি আমি, একদিন শেষে
আপনি সে দেখা দিবে এসে!
মোর মৌন-অর্ঘ্যখানি
নিজহাতে লবে টানি
সযতনে—স্নিগ্ধ-মধু-হেসে।
সন্ধানের সন্ধ্যা এলে সুন্দর রবে না আর দূরে,
বাঁশরির সুর তার, শুনিতে পেয়েছি প্রাণ-পুরে।

লীলা-কমল

বক্ষে উতল ঘন-মধু-রস মর্ম সুরভি-ভোর,—
প্রভাত-রবির প্রেম-অঞ্জনে পরানে রঙের ঘোর।
মেলিয়াছি আঁখি, আমি জলবালা, সূর্য-স্বয়ম্বরা,
ঊর্ধ্বে পসারি মৃণাল-গ্রীবাটি
হেরিতে আসিনু তরুণ-দিবাটি,
হেরিতে আসিনু সোনার কিরণে কনকোজ্জ্বল-ধরা।

জ্যোতির্ময়ের রূপ-বারতায় ধ্বনিত পুবের পুর,
নিতল-জলের তল ভেদি বুকে বেজেছে যে সেই সুর।
কুঞ্জ-কাননে ফুল-মালঞ্চে লই নাই আমি ঠাঁই,
পঙ্ক-আসনে সাধন নিত্য,
ইষ্ট আমার নব-আদিত্য,
সলিল-শয়নে সমাধি হলেও শিশির সহে না তাই।

সপ্তবরণে বরি নিতে আজ গুণ্ঠন দিছি খুলি,
লীলায়িত করি সুন্দর-তনু শূন্যে ধরেছি তুলি।
আসে মৌমাছি, মধুপ, মানব
লুটে লয়ে যায় সব-বৈভব,
আমি ভাবি মোর আলোর দেবতা কখন আসিবে বুকে,
তনু-মন-ধন অর্পিয়া তাঁরে, ঝরিব সকৌতুকে।

উৎসুক মোর উন্মুখ-মুখ সুখে অবনত হবে,
প্রিয়-বিরহের ব্যাকুল-বেলায় সন্ধ্যা নামিবে যবে!

আনত-বৃন্ত এ আননে মম,
বিদায়-চুমাটি দিবে প্রিয়তম,
অস্তরাগের অনুরাগে মোর অঙ্গ পড়িবে ঢলি,
সার্থক হবে লীলাকমলের অন্তিম-অঞ্জলি।

বিকাশ

জাগিল যৌবন-পদ্ম। টুটিল সহস্র-দল-কারা।
ফুটিল গো ফুল।
আপন-অন্তর-গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহারা
—বিহ্বল-ব্যাকুল।
উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে-মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্যচ্ছুরে অধরে অতৃপ্ত-তৃষা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ-গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল ;
জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে—
আলোকে উজ্জ্বল।

কোথা গো তরুণ রবি! কমলের বল্লভ-অরুণ!
স্বর্ণকর-জালে
আতপ্ত-চুম্বন-রাগ এঁকে দাও কুঙ্কুম-করুণ,—
প্রিয়ার কপালে।
যৌবন জাগিল যদি অন্ধ-অন্তরের গন্ধ-গানে
উন্মীলিয়া আঁখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকাল দিক্‌পানে,—
—কোথা সেই প্রেম-সূর্য? তূর্য যাঁর ধ্বনিল তাহার
বক্ষের স্পন্দনে,—
তাঁরি তরে পূর্ণ-পাত্র অমৃত-উচ্ছল উপহার
দেহের নন্দনে।

স্ফূরি সপ্তবর্ণচ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিল উচ্ছলি।
নিশার নিকষ-প্রান্তে প্রভাত-সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ-রূপ-রাগে দেহ-মন-প্রাণ ঘিরে-ঘিরে

ফুটিছে মাধুর্যচ্ছবি রহস্য ঘনায়ে,—তনু মনে
রচি ইন্দ্রজাল,
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভরা-ভাদ্র-পূর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

অধীর-অন্তর আজ আনন্দে ব্যথায় ধৈর্যহারা,
—ব্যাকুল চঞ্চল।
রাজার কুমারী কারে খুঁজে ফেরে ভিখারিনী-পারা
লুটায়ে অঞ্চল!
মধুচ্ছন্দা মন্দবায়ু দক্ষিণ-সাগর হতে আসি
আকাশে আকাশে যেই সে বারতা দিল পরকাশি
জাগিল জীবন-কুঞ্জে অজানিত পুলক-পরম,
—গোপন-গভীর।
রস-সমুচ্ছল-অঙ্গে রোমাঞ্চিল প্রসুপ্ত-সরম
অরুণচ্ছবির।

ফুটিল যৌবন-পদ্ম। থর-থর কাঁপে নীল-নীর,
সমীর মূর্ছিত ;—
পুলকের বন্যাবেগে বালুবেলা তরঙ্গ-অধীর
ফেন-উচ্ছ্বসিত।
উচ্ছল-বেদনামধু মর্মকোষে অবরুদ্ধ করি
ফুটিল যৌবন-পদ্ম গন্ধের অঞ্জলি ঊর্ধ্বে ধরি,—
কোথা গো দেবতা মোর! যৌবনের সার্থকতাবহ,
—প্রাণ-ঘন-প্রেম!
জীবনের শ্রেষ্ঠধন! এসো এসো, পূজা-অর্ঘ্য লহ
ইন্দীবর-হেম।

অভিসারিণী

পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছ মোরে রাখতে ঘিরে!
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবেনাকো;—
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিকো তাই দাঁড়িয়ে থাক
সৃষ্টি-করার আনন্দ কী বিপুলতরা,—
—ঊষর-মাটি শষ্পে ভরা!

অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছ মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল-বাহু প্রসার করে!
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে,—
মর্মরিয়া দীন-মিনতি গুঞ্জরিছ অবোল-মুখে।
থামার সময় নেইকো আমার ;—তোমার দেহে
সবুজ করে গেলাম স্নেহে।

উপল! ওগো উপল! তোমার শিকল-ডোরে
মিছাই সখা বাঁধতে প্রয়াস করছ মোরে!
অচল হতে জন্মি চলি অগাধ পানে,
সুনীল-আকাশ নীল সাগরের স্বপন দেছে জাগিয়ে প্রাণে!
রঙ ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চল্‌ছি ছুটে,—
মত্ত-গানের নৃত্যে লুটে!

তটভূমি লো, তটভূমি! তোর প্রয়াসরাশি,—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল-হাসি।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয়-বাহুর সীমার বেড়ে,—
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি-ঘর কি ছেড়ে?
বিপুল-ভাঙন কখন্‌-কখন্‌ তাইতো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি।

কুসুমলতা ক্ষেত তরু বন পাথর মাটি—
ডাক্‌ছে,—নদী! থাম্‌ল, দিব পুলক বাঁটি!
চলার নেশায় মাত্‌ল যে-জন, হায়গো তারে
এই ধরণীর অচল যারা—তারা কি কেউ বাঁধতে পারে?
বন্ধুরা সব! করতে হবে আমায় ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইল জমা!

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্র-রূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ,—আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপনা-সঁপে ঊর্মিলা হও স্বয়ম্বরা—
ঢেউগুলি মোর ভাবছে—'সাগর কখন্‌ পাবো ;
যাবই, ওগো! যাবই যাবো।'

কালি শুক্লা চতুর্দশী রাতে

কালি শুক্লা চতুর্দশী রাতে,—
দক্ষিণের মধুচ্ছন্দা
বায়ু—মৃদু-ফুলগন্ধা
আলিঙ্গিয়া গেছে মোর সাথে।
সারা তনু-মন মম সে-পরশে সহসা শিহরি—
অপূর্ব-পুলক-রসে উথলি উঠিয়াছিল ভরি,
অজানা-আনন্দে কম্প্র-হিয়ার উল্লাস-মধু ক্ষরি
উদ্বেলিল তনু ;
রোমাঞ্চ জাগিল অঙ্গে,
দিঠিতলে সঙ্গে-সঙ্গে
ফুটিল স্বপ্নের ইন্দ্রধনু।

কালি শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে
বকুল-বীথিকাতলে
নব-শ্যাম-দূর্বাদলে
কুসুম ঝরিল মোর মাথে।
চুমিয়া ললাট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িল কটি বৃন্ত্য-খসা শিথিল-বকুল,—
অসহ-হরষ-রসে শান্ত-তনু তটিনী দুকূল
প্লাবি এলো বান।
বক্ষ-তটে হল সুরু
ঘন-কম্প দুরু দুরু
যৌবনের গান।

কালি শুক্লা-বাসন্তিকা-নিশা,
প্রথম-বসন্ত গীত
নিয়ে হল উপনীত
মোর দ্বারে, প্রেম-তৃষা-মিশা।
সে সংগীতে দেহ-কুঞ্জে যৌবনের শ্যামা দিল শিস্,
সে সংগীতে নব-ভঙ্গি পেল মোর প্রতি অহর্নিশ,
সে সংগীতে একসঙ্গে ক্ষরিল অমৃত-সনে বিষ
চিত্ততলে মম।
অজানা-আনন্দ সনে
অকারণ-ব্যথা মনে
স্পর্শিল প্রথম।

ওগো—শুক্লা নিশাতলে কাল্‌,
প্রান্তর-সীমান্তে দূরে—
সকরুণ বংশীসুরে
ডাক দেছে অচেনা-রাখাল।
সে বাঁশির রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অশ্রু-ঝরা—মিনতি মধুর,
বিধুর করিলো বক্ষ, লাজমৌনা জীবন-বধূর,—

সুদূর-সুহৃদ্‌-স্বপ্নে আঁখি-পদ্ম-অশ্রু-পরিপূর,
বুকে সুখাবেগ ;—
না জানি কাহার তরে
ফুটিল মানস পরে
বিরহের মেঘ।

কালিকার শুক্লা-চতুর্দশী,—
ঘুমন্ত-চিত্তের পর
জাগানিয়া-জ্যোৎস্না-কর
ঢেলে গেছে চুপে-চুপে শশি।
উন্মীলিত-নেত্রে তাই নূতনের অঞ্জন লেগেছে,
মানস-মালঞ্চে মধু-মাধবীর উৎসব জেগেছে,
আজিকে জীবন-বঁধু বঁধুয়ার পরশ মেগেছে ;
—ফুটিয়াছে কলি,
অনুরাগ-কোষে তার
আনন্দের গন্ধ ভার
উঠেছে উচ্ছলি!

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—

বন্ধ-দুয়ারে রন্ধ্র নাহি যে, গন্ধ আমার কাঁদে—
সন্দ জাগিছে—অন্ধ কি আমি অন্ধকারের ফাঁদে?
ও মা তরু তুই বল্‌ মোরে আজ,—
জীবনে কি মোর নেই কিছু কাজ?
—কেন রেখেছিস্‌ আঁধারের মাঝ?
নাহি কি মমতা তোর,—
দলে-র কঠিন-বাঁধন কেন গো
অঙ্গ বেড়িয়া মোর?

রুদ্ধ-কারায় বদ্ধ রহিয়া তবুও বক্ষে কেন,
অনাগত কোন্ অতিথির আসা—আশা-ভাষা লেখে যেন!
কার মিলনের অজানানন্দে
অন্তর মোর ভরেছে গন্ধে,—
বিচিত্রতর ব্যাকুল-ছন্দে
কিঞ্জল্কেরা জাগে,
অধীর-চিত্ত কার দরশন
পরশন-মধু মাগে!

প্রাচীরের আড়ে রহিয়াও তবু কত কী যে শুনি মাগো,
কে যেন ডাকিছে ঘন-অনুরাগে—সখি জাগো, সখি জাগো!
গুঞ্জন তুলি মধুময়-সুরে,
কারা যেন মোর চারিপাশে ঘুরে!
বিপুল-পুলকে বুক ওঠে পুরে,
—খুলে দে মা বন্ধন!
আমার না-দেখা বন্ধুরে দিব
বুকের গন্ধ-ধন!

মৃদুল উষ্ণ-চুম্বনে কার, কঠিন-অঙ্গ মোর
শিথিল হইয়া পড়িছে আপনি,—কেটে যায় ঘুম-ঘোর!
—প্রভাতের আলো?... শুনিয়াছি নাম,
রূপ নাকি তার নয়নাভিরাম!...
স্ফুটন-মন্ত্র কানে অবিরাম
ঢালে বল কোন্ বঁধু?
কার অনুরাগে শিহরণ জাগে?
বুকে জমে ওঠে মধু!

দখিনা-বাতাস?—তারই ছোঁয়া একি? মাগো মোরে ধর, ধর,
চিনি আমি তার চরণের ধ্বনি,—ওই শোন্ মর্মর!
তার আগমনে কিশলয় মোর
বিকাশ-স্বপনে হয় যে বিভোর,
পরশন তার প্রাণ-মন-চোর—
—উতলা তাহার বাঁশি,
ঘর-ছাড়া-করা—মায়া-সুরে ভরা
গৃহ-বন্ধন-নাশী!

সারা-তনু মোর এলায়ে পড়িছে!...বিপুল-পুলক জাগে!
গোপন-বর্ণ গাঢ় হয়ে ওঠে সুনিবিড়-প্রেমরাগে!

অধীর-প্রণয়ী ভ্রমরের গান,
না-ফুটিতে মোর মোহিয়াছে প্রাণ,
—বিকাশ-প্রার্থী অতিথির মান
কি দিয়ে রাখিব বল্,
একটু বর্ণ—মধু ও গন্ধ
দীন-হীন-সম্বল!

কাহারে দিব মা সৌরভ-ভার?—কারে দিব মধুটুক্?
কারে অর্পিব বর্ণ-বিভব? পরিমল-প্লুত বুক!
না-দেখেও যারা মোরে চিনিয়াছে,
বিকাশের আগে মধু কিনিয়াছে,
অবরুদ্ধার প্রেম জিনিয়াছে,—
সে-বন্ধুদল এলে,—
স্বাগত-আদরে বরিতে পাব কি
মর্মের কোষ মেলে?

চিনিতে তাদের পারিব তো আমি? তাই তুই মোরে বল্!
তারা না-আসিতে ফুরায় না যেন সৌরভ-পরিমল!
মোর পানে আঁখি মেলি অনিমিখ
তাকাবে যখন,—চিনিব তো ঠিক?
—গন্ধে তখন ভরে যেন দিক্,
—বুক না এমন কাঁপে,
পাপ্ড়ি আমার কুঞ্চিত হয়ে
সরমে না মুখ ঝাঁপে!

বিশ্ব-আকৃতি

আলো! ওগো আলো! দিবা-দীপ জ্বালো, ঢালো রবিকর চোখে-
অন্ধ-কুঁড়ির মূক-ক্রন্দন মন্দ্রিল লোকে-লোকে!
আঁধার-ধরার অশ্রু-নিশাসে কুজ্ঝটি ওঠে জমে—
মহাকাশ থম্‌থমে—
নিথর-পৃথিবী স্তম্ভিত মূক,—অভাবিত কোন্-শোকে!

সপ্তলোকের প্রাচীন টুটিল রুদ্ধ-ব্যথার বেগে,
কালোর গর্ভে আলো-বিদ্যুৎ ঘনাইল মেঘে-মেঘে!

নীরব-প্রশ্নে সৌর-আকাশ আলোড়ি উঠিল তায়,—
বসুধার বেদনায়!
আঁধার-কারার বন্দীরা যত, উঠিলরে আজ জেগে!

বিদ্রোহপুর সে-কাতর সুর পশিল অরুণ-লোকে!
তরুণ-সূর্য উকি দিল পূবে বিস্ময়-স্মিত চোখে!
কিরণ-পরশে টুটে গেল দৃঢ়-তামস-লৌহদ্বার,
মহা-ঝন্‌ঝনি তার
বিহগ-কণ্ঠে ঝঙ্ক উঠিল ;—বাতাস শঙ্খ ফোঁকে!

সারা-জগতের মানুষ কাঁদিছে—ওগো আলো—ওগো প্রাণ!
—নরের শৌর্য-পীড়িতা নারীর অন্তর-আহ্বান
বিপুল বেদনা-মূক-ক্রন্দনে ঊর্ধ্বে ধূমায়ে উঠে
শক্তির পায়ে লুটে।
বন্দী বিশ্ব-আত্মা করিছে মুক্তি-আলোর ধ্যান।

শত শৃঙ্খলে প্রকৃতিরে বাঁধি পীড়ন করিছে নর,
কাঁদে যৌবন সৃজন-ব্যথায়,—দেবতা নিরুত্তর!
পাশব-শাসনে জীবন কাঁদিছে—কাঁদে প্রেম—কাঁদে স্নেহ,—
এ ভুবন কারা গেহ।
—কখন্ উদিবে প্রলয়-প্রভাতে সত্য-তপন কর!—

রক্ত-গোলাপ

রুদ্ধ-ব্যথার রক্তরাগে রঙিন হয়ে উঠ্‌লে গো
কণ্টকাকুল কুঞ্জ-কানন-কোলে,
সব্‌জে শাড়ির ঘোমটা তুলে আলোর ছোঁয়ায় ফুট্‌লে গো
দখিন-হাওয়ার মন্দ-মৃদুল দোলে!
রক্ত-গোলাপ! রক্ত-গোলাপ! তোমার রাঙা বুকের খুন,
কোন্ তরুণীর তপ্ত-হিয়ার ব্যর্থ-অনুরাগ করুণ!

অন্ধ-কারায় বন্দী কলির সুপ্তি-অসাড় ভাঙ্‌ল কে
সোনার কাঠির মন্ত্র-স্বপন ছেয়ে!
সরমরাগের আল্‌তা-গোলায় গাল দুটি তার রাঙ্‌ল যে
আকাশ-আলোর প্রথম-পরশ পেয়ে।
বঁধুর ছোঁয়ায় সকল বাধা আপনা হতেই টুট্‌ল গো!
ভোরাই-হাওয়ার-ভেলায় সুবাস দিক্‌দিগন্তে ছুট্‌ল গো।

রঙের নেশায় মত্ত মধুপ কাঁটার বনে ঝাঁপায় অই,
করুণসুরে দিক্ ভরে বুল্‌বুল্‌!
রূপ-পিপাসুর আঁখির পরশ বুক কি তোমার কাঁপায় সই,
ফোটার পথে হঠাৎ ঘটায় ভুল?
হায় রূপসী! সুসজ্জিতা! কোন্ বেদনার লজ্জাতে,—
ব্যর্থতারই গোপন-দুখে কাটাও কাঁটার শয্যাতে!

রক্ত-গোলাপ! রক্ত-গোলাপ! গন্ধকোষের বক্ষ তোর
ব্যর্থ-প্রেমের গোপন-ব্যথায় পুর ;
রেশমি কোমল-পাপ্‌ড়ি দলে দুল্‌ছে শিশির-অশ্রুলোর
গন্ধে জাগে দূর-বিরহের সুর!
কোন্ অনাদি অতীত হতে প্রেমিক-হিয়ার ব্যথার চিন্
প্রতীক্-লেখায় রাখতে লিখি,—আপনি হলে রাগ-রঙিন!

মীরার ব্যথা

রানার মহিষী মহারানী-মীরা, একথা বোলো না আর,
আমি তোমাদের কেহ নহি ওগো, এ প্রাসাদ কারাগার!
ব্যাকুল বিরহ-বেদনা-অনল
সারা দেহ-মন দহে অবিরল,
পরান-প্রিয়র বিচ্ছেদ বহি বেঁচে থাকা গুরুভার,
উতল-হৃদয় উন্মুখ সদা মিলন মাগিছে তার!

ওগো বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি আমি,—সহি কী অসহ-জ্বালা
কুলটার কালি ললাটে লেপিয়া নিল যত গোপবালা।
আজি বুঝিতেছি মরমে-মরমে,
কুল মান ভয় ধরম-সরমে
যমুনার নীরে ডারি দিয়া, শিরে নিল কলঙ্ক-ডালা
কেন কুলবধূ?—আপনা পাসরি কালারে পরাল মালা!

রাজার ঝিয়ারী রূপসী পিয়ারী কনক-প্রতিমা-রাধা,
বুঝিয়াছি কেন রাখালের প্রেমে মানিলো না কোনো বাধা!
নাগ-সঙ্কুল কণ্টকবনে
আঁধার-নিশীথে বিপথে বিজনে
শিরে বহি ঝড় বজ্র—বরষা—পথে পিচ্ছিল-কাদা,—
বল্লভ লাগি নিতি কেন তার ছিল অভিসার-সাধা!

মিছা সম্ভ্রম সম্মান মোর, রাজ-বিধি লাজ-ভয়।
সারা মন প্রাণ কাঁদিয়া কহিছে—কিছু নয়—কিছু নয়!
প্রেমের পরশমণি প্রাণে যার
ছোঁয়া দিয়ে গেছে,—এ জগত তার
শিশুর তুচ্ছ-ক্রীড়নক সম।—সংসার অভিনয়
নিমেষে সকলি যায় মিলাইয়া। সব-বাধা হয় লয়।

স্বামীর সোহাগ-পরশে আমার দেহ কুঞ্চিয়া ওঠে,
মনে হয় তনু হয়েছে অশুচি,—দু-নয়নে ধারা ছোটে।
এ মোর স্বর্ণপ্রাসাদ-কক্ষে
সদা যেন হেরি বিভোর-চক্ষে
বৃন্দাবনের ব্রজরেণুময় গোপ-গোকুলের গোঠে!
স্বপনে আমার শ্যামের প্রেমের পরম-কমল ফোটে।

এ তনু শুদ্ধ করে লব সেই নীল যমুনার নীরে,
প্রেমের ঠাকুর যেথা আছে মোর, যাব সেই মন্দিরে!
বাঁশরি যে তার পশিতেছে কানে,
বনমালা-বাস ভাসে আঘ্রানে,
সুখ-দুখ-বোধ লুপ্ত আমার,—চেতনা ডুবিছে ধীরে!
ওগো ছেড়ে দাও,—মীরা যেথাকার, চলে যাক্ সেথা ফিরে।

যাচঞা

তুমি ভালোবাসোনাকো বলে
করিব না আর অভিমান।
জীবনের ক্লান্ত-সন্ধ্যামায়া
নয়নে ঘনায় ম্লানচ্ছায়া.—
গোধূলির রক্তচিতা তলে
দিবসের শেষ-অবসান।
তোমার যা কিছু মিথ্যা-মধু—
উপহার দাও আজি বঁধু।

তোমার যা সত্য তাহা আজ
ভালো করে ঢাকো বন্ধু, ঢাকো,-
কহ মিথ্যা নিতল নিলাজ
আজি আর সত্য চাহিনাকো।

তব তিক্ত-সত্য-সুকঠিন
বজ্র সম কোমলতা-হীন,—
নির্মম সুতীক্ষ্ণ-ধার তার
সহিবে না বক্ষে আজি আর!

ওগো বন্ধু! ভাণ্ডারে তোমার
মিথ্যার মানিক-মালা আছে ;
আজি শেষ-বিদায়ের ক্ষণে
কোনও দ্বিধা রাখিব না মনে ;—
—তব মিথ্যা-প্রণয়ের হার
আজি মোর শূন্যকণ্ঠ যাচে।
মিথ্যারাগে রচা মাল্যখানি
লব মানে, বহুমূল্য দানি।

রিক্ত-করে অজানা-বিদেশে
একা যেতে ভয় বাসি, তাই
গর্ব ত্যেজি অন্তিম-নিমেষে
তোমার কৃত্রিম-প্রেমে চাই।
তোমার আপন-হাতে-দান
মিথ্যা,—মোর মানিব সম্মান,
আমার বিশ্বাস-ছোঁওয়া লেগে
সত্য হয়ে উঠিবে তা জেগে।

ক্ষণিক-আদরে তব, প্রিয়
তৃষিত-জীবন তৃপ্ত হক্—
সত্য আর-সবাকার রক্,
তুমি শুধু মিথ্যা মোরে দিও।

প্রেম-প্রশস্তি

হে চির নির্মল! তব প্রাণ-ঘন নিবিড়-পরশ
দাও-দাও মর্মে মোর,—করো চিত্ত অমৃত-সরস!
পুঁথির মানুষ হয়ে রবো বেঁচে আর কতকাল?
কণ্টকিত জীবন মৃণাল
সার্থক হবে না কিগো প্রস্ফুট-পঙ্কজ খানি ধরি
তোমার পরম-স্পর্শে,—গন্ধে-বর্ণে উঠিবে না ভরি!

করো দূর—করো চূর—পুঞ্জীভূত অসত্যের কালো,
এ মনোমন্দিরে দীপ জ্বালো।

হে ঐন্দ্রজালিক! তব স্বর্ণ-মায়াদণ্ড ছোঁয়াইয়া,
গর্বিত কঠোর-চিত্ত চিরতরে দাও নোঙাইয়া।
বহাইয়ে দাও নদী গলাইয়ে জমাট্-তুষার।—
স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ সুন্দর উষার
রঞ্জন লেপিয়া দাও নিশার নিকষ-কৃষ্ণ ভালে।
হে কান্ত! মানব মর্মে তুমি যুগে-যুগে কালে-কালে
কত ছদ্মে কত ছন্দে চিরন্তন নববেশে আসো
ধরণীরে মুগ্ধ ভালোবাসো।

তুমি যে স্বর্গের দূত, রহ ঊর্ধ্বে অমরার গেহে,
মানুষেই শ্রদ্ধা তুমি করিয়াছ দেবতার চেয়ে!
সর্ব-দুর্বলত ত্রুটি নিঃশেষে নিমেষে যায় মুছি,
তুমি যারে স্পর্শ—ওগো শুচি!
সামান্য-মানব-শিরে দেবত্বের প্রদীপ্ত-মুকুট
তুমিই পরাতে পারো,—সুধারসে ভরি প্রাণপুট!
স্বর্গের স্বরগ তুমি রচ এই ধরার ধুলায়,
মানবের হৃদয়-কুলায়।

আপনারে যত তুমি নিঃশেষে অর্পিতে চাহ,—আরো
পুঞ্জে-পুঞ্জে ঘন হয়ে জমে ওঠ গভীর প্রগাঢ়।
অদৃশ্য ফল্গুর সম কায়া তব আঁখির অতীত,
অস্তিত্বেই পরম-প্রতীত।
এ বিশ্ব-মানব তাই চিরন্তন তৃষা-শুষ্ক-প্রাণ,
যুগে-যুগে সক্রন্দনে অন্বেষিছে তোমারি সন্ধান!
তব বহির্বাস পরি ছদ্ম-কাম-মূঢ় নারী-নরে
সর্বনাশা-প্রতারণা করে।

উদিয়া দেহের গেহে দেহাতীত-লোকে তব গতি,—
জীবনের সর্ব-দৈন্য সব-অপ্রাপ্তির ক্ষোভ-ক্ষতি,
পুষ্পসম দলি পায়ে চলি যাও অসীমের পথে
স্বার্থভোলা আনন্দের রথে।
না-পাওয়ার মাঝে তাই পরম-পাওয়ার স্তুতি গাও,
বিরহে গভীরতর-মিলনের আস্বাদন পাও!
প্রিয়ের কল্যাণ লাগি উতরিয়া ত্যাগ সিন্ধু-কূলে,
আপনার সত্তা যাও ভুলে।

তুমি তো রচেছ বন্ধু, ধরণীতে কল্পনার মায়া,
বাস্তব-মরুর দাহে সৃজিয়াছ স্বপ্ন-তরুছায়া।
মরমে মাধুর্য-মধু, আঁখি-তটে রহস্য-আভাস,
অধরে অমৃত-স্নিগ্ধ হাস!
মৌনতার মাঝে তুমি কহ যেই সুগভীর-বাণী,
নিখিলের লিপি নারে—লিখিতে তাহার রূপখানি।
ভর্ৎসনা অমিয়া সম মিষ্ট বাসি তুমি দিলে ছোঁওয়া,
জীবনে না যায় কিছু খোওয়া।

পাত্রখানি রিক্ত করি যত তুমি ঢেলে-ঢেলে দাও,
পরিপূর্ণ হয় পাত্র। সম্মুখে পশ্চাতে নাহি চাও,—
ঊর্ধ্বে ধ্রুবলোক পানে নিখিল-বিস্মৃত লক্ষ্য-পাখি
উড়ে চলে উধাও একাকী।
অসুন্দরে করিয়াছ পরম সুন্দর ওগো গুণী!
অযোগ্যেরে শোভিয়াছ আপনার কল্পজাল বুনি,
দীনতমে দিতে পার রাজাধিরাজের সিংহাসন,—
মূক কণ্ঠে মুখর-ভাষণ!

জীবনের অর্ঘ্যপাত্রে যৌবনের ফল-ফুল-রাশে
সর্ব সমর্পিয়া নারী মুগ্ধচিত্তে কারে ভালোবাসে?
কারে সে আহ্বানে নিত্য,—এসো এসো হৃদয়ের ধন!
লহ নিঃশেষিত-নিবেদন।
সে নহে দেহের পূজা, সে তো নহে যৌবনের স্তুতি,
মানব-অন্তর-লোকে যে-অপূর্ব স্বর্গীয়-আকুতি
রস-ঘন-ব্যঞ্জনায় চিত্ত করে নিকষিত-হেম,—
প্রাণ-অর্ঘ্য লয়ে নারী
প্রতীক্ষা করিছে তারি,
যুগে-যুগে জন্মে-জন্মে, নিত্য-সত্য প্রেম।

নারী ও প্রেম

জানি জানি হে দেবতা! নারীর অন্তর কুঞ্জে
যেদিন তোমার পুষ্প জাগে,—
মর্মের মলয় তার বিপুল-সুরভি-পুঞ্জে
আনে বহি, মুগ্ধ-অনুরাগে।

সে সৌরভ-রসে নারী আপনা হারায় নিত্য
বিস্মরয় দোষ-গুণ ভেদ,—
মন-মণি-মঞ্জুষায় পরশ মানিক-বিত্ত
তৃপ্ত রাখে সর্বতর খেদ!

সুদৃঢ় পাষাণে গড়া লৌহদ্বার মর্মপুরে
নিঃশব্দে অর্গল যায় ছুটি,—
কঠিন প্রাচীর-শ্রেণী মৃদুল-সোহিনী সুরে
পুষ্প সম পড়ে টুটি-টুটি!
সেদিন স্বেচ্ছায় নারী সর্বাঙ্গীণ-অধীনতা
লহে বরি সঁপি তনু-প্রাণ,
চিত্তের আনন্দরাগে দীপ্ত হয়ে সে-দীনতা
রানীর গৌরব করে দান।

কার লাগি সর্বযুগে সর্ব দেশে-কালে নারী
স্নিগ্ধ-স্নেহে চির-ত্যাগশীলা,—
পুরুষ-পুরুষ-মর্মে সিঞ্চিয়া অমৃত-বারি
রচে মর্তে অমর্তের লীলা!
আপনারে রিক্ত করি নিঃশেষে করিয়া দান
কেন তার উদ্বেলিত-সুখ?
সংযমে সেবায় পুণ্যে ক্ষমায় সুন্দর-প্রাণ
কি লাগিয়া বিমুগ্ধ উৎসুক!

কে তারে শিখাল বলো মৌন-অভিমান লীলা
হাসি-অশ্রু ইন্দ্রধনু-জালে,
কভু দীপ্ত-জ্যোতির্ময়ী কখনো সরমশীলা
আরক্ত গোলাপ-রাগ গালে!
রহস্য-অতল চক্ষে বিচিত্র চাহনি-তীর,
অধরে বিচিত্রতর হাসি,
কে তারে অজেয়া করি দিল নেত্রে অশ্রু-নীর,-
অমোঘ আয়ুধ রাশি-রাশি!

মোর বসন্তের পুষ্প কোন্ বসন্তের এক
পরিণাম-রমণীয় সাঁঝে,—
সুন্দর-মাল্যের রূপে সার্থকতা লভিবেক
দুলিয়া ও কম্র-কণ্ঠ মাঝে!
শিহরি উঠিবে চম্পা,—বকুল ব্যাকুল-চিতে
নিঃশ্বসিবে সুরভি-নিঃশ্বাস,

শুক্লা হবে দুখ-রাত্রি রজনীগন্ধার গীতে
আছে চিত্তে পরম-বিশ্বাস!

হে নিত্য, হে চিররম্য, সুচির নবীন বন্ধু!
হে শাশ্বত! সুন্দর-পরম।
আজিকে তোমার বংশী আমার হৃদয়-রন্ধ্রে
তুলেছে তরঙ্গ মনোরম!
আজিকে তোমার বার্তা অপরাজিতার কুঞ্জে
ফুটায়েছে জয় নীল-ফুল,
অরণ্য-লক্ষ্মীর বক্ষে মালা শোভে পুঞ্জে-পুঞ্জে
কর্ণে দোলে সৌরভের দুল!

আবর্তিত ঋতুচক্রে বসন্ত ধরায় নামি
লীলা-নৃত্য করে ক্ষণকাল,
আমার অন্তরপুরে তুমি জানো অন্তর্যামি!
তারি চির-মহোৎসব-জাল!
উৎসব-অঙ্গন-পথে যারা নিত্য আসে যায়
আমি খুঁজি তাহাদেরি মাঝ
কোথায় রয়েছ তুমি,—কার মৌন-আঁখিচ্ছায়ে
হে আমার রাজ-অধিরাজ!

শুধু যে তোমারি লাগি যুগে-যুগে চিরদিন
রচি নীড় মর্ম-মধু দিয়া,—
নিরুদ্দেশ পথ-যাত্রী পান্থ যত লক্ষ্যহীন,—
যেথায় বিশ্রাম লভে গিয়া!
সবার হৃদয়-তলে আমি খুঁজি সত্তা কার?
হে নারীর চির-অন্বেষিয়!
তোমা লাগি রচি নীড়, গাহি গীত, গাঁথি হার,-
ওগো প্রেম! আত্মার আত্মীয়!

বর্ষ-বিদায়

আজ
ফুরায়েছে কাজ!
বসন্তের ঝরা-ফুলে ঢাকা
পরাগ-পুটিত পথে মোর রথ-চাকা
করুণ-ক্রন্দন-স্বরে বিদায়-পূরবী-ধ্বনি তুলি
চলিয়াছে ক্লান্ত-গানে চির-অস্ত পানে। মাধবের রথচক্রধূলি
গগনে পাটল করি দিগন্তে ছড়ায়ে রক্ত আভা,—আনন্দ-ঘর্ঘরনাদে আসে!
কিরণ-কিরীট-শির দীপ্তদেহ বৈশাখের শাঁখ—বাজিয়াছে আকাশে-বাতাসে!
প্রদীপ্ত-দীপকে মোর হয়ে গেছে গাওয়া—মাধবের নব উদ্বোধন ;
শুক্রের কঠোর-কৃচ্ছ্র পঞ্চাগ্নির তপঃ-সমাপন!
শুচির সুচির রুচি পাথোধর পথে,
মোহিয়া ময়ূরী মনোরথে,
আসিয়াছি ফিরে,
ধীরে!

এই
রিক্ত-আঁচরেই
ভরিয়াছি কাজরীর গান!
হরিয়াছি নীপ-কুঞ্জে শিখিনীর প্রাণ—
সজল-শ্রাবণ রূপে ঘন ঘোর গিরি-চূড়া চুমি।
ভাদ্রের ভরন্ত রূপে ভরসা দিয়াছি—কাশের আনন্দে ছেয়ে ভূমি!
ইষতে ঈষৎ নহে ঈশ্বরী আনিয়া দিছি গেহে—আনন্দের নাহিকো তুলনা।
কার্তিকে আকাশ-বর্তি মর্ত্য-বার্তা স্বরগে দিয়াছে—তার মধু-স্মৃতিটি ভুল না।
হায়ণের নবাগমে নূতনের পূজা—নবান্নের আনন্দ-উৎসব!
পোষেড়ার পর্ব-প্রিয়-গীতি করে প্রীতি-যুত সব!
মাঘের তুষারে জাগে বসন্তের আশ ;
ফাগুনের আগুন-নিঃশ্বাস:
এবে মাস মধু,—
বঁধু!

ভাই,
ব্যথা মোর নাই!
কত নব-নব বর্ণ-রাগে
অভিনব-আলিম্পন মম অঙ্গে জাগে,
ষড়ঋতু স্মিত-পুষ্পে স্বহস্তে যা দিয়াছে আঁকিয়া
পরিপূর্ণ-বরষের রসে পূর্ণ-করা—পাত্রখানি গেলাম রাখিয়া।

নিদাঘের খর-দীপ্তি, বাদলের কাজল-ঘনিমা,—শরতের স্বর্ণ-আলো-বাঁশি,—
হেমন্তের হৈম শোভা, শীতের কুহেলি ধূম্রজাল,—বসন্তের বর্ণ গন্ধ হাসি
সবই আছে পুঞ্জীভূত, সুখ-সুরভিত—অশ্রুর শিশির-জলে ধোওয়া,
হাসির হেমাভা আছে বেদনার বিবর্ণতা ছোঁওয়া!
আনন্দের অলক্তক, হতাশার কালি,
সবই পাবে স্মৃতি-দীপ জ্বালি ;
আর নাই,—তাই
যাই!

হায়,
এসেছে বিদায়!
যত কিছু দোষ ত্রুটি ক্ষতি,
অন্যায়, বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি অবনতি
আমা হতে লভিয়াছ যারা সব,—কোরো ভাই ক্ষমা,—
নবীন-বরষাগমে তাহাদের যেন—দূর হয় জীবনের অমা!
আশার মৃণালে যার, উদ্যমের কঠিন-কোরকে—ফুটিয়াছে সাফল্য-কমল,
তাহাদের অন্তরের পূত কৃতজ্ঞতা-ধারা, মম—যাত্রাপথ করেছে অমল!
মোর সদ্য-বিদায়ের বেদনায় ভরা—এই ম্লান পাংশু পথখানি
হরষ-কুসুমদামে এখনি আচ্ছন্ন হবে জানি
নব অতিথির লাগি ; সেই-ই মোর সুখ,
তৃপ্তিভারে পরিপূর্ণ বুক,
যাই অস্ত-পানে ;
গানে!

যাই,
আর দেরি নাই।
চৈত্র-সংক্রান্তি-র নিশা-শেষে
বিবর্ণ-পাণ্ডুর-শশী ম্লান-হাসি হেসে
পশ্চিম গগন প্রান্তে ধীরে-ধীরে ঢলে পড়ে অই ;
নিভে আসে শুক্রতারা নিস্প্রভ-নয়নে,—পূর্বাচলে জাগিবে বিজয়ী।
হে মধু-সংক্রান্তি-শেষ-নিশিথিনী! বিদায়!...বিদায়!... বিদায় গো সুপ্তনীড় পাখি!
সুখসুপ্তি-মগ্ন ওগো ধরাবাসী!...উপাধান-পাশে—কল্যাণ কামনা গেনু রাখি!
ধ্যানমগ্ন-অরণ্যানি!...স্বপ্নমুগ্ধা-নদী! সুখ-মৌন নিস্তব্ধ-আকাশ!
অর্ধ-স্ফুট-পুষ্পকলি!...ছায়াচ্ছন্ন-গিরি!...নিস্তব্ধ-বাতাস!
বিদায়!...বিদায় বন্ধু সবাকার কাছে!
আর মোর নাহি কিছু আছে
প্রদানের লেশ!
শেষ!

পরিণীতার পত্র

প্রিয়তম! কবে কোন্ বসন্তের গোধূলি-লগনে
মনে পড়ে যুগ্ম-শঙ্খ বেজেছিল গম্ভীর-সঘনে।
কল্যাণী আয়তি-কণ্ঠে সম্মিলিত-শুভ উলুরব
নন্দিত করিয়াছিল দু-জনের মিলন-উৎসব।
সুচিকণ-চন্দ্রাতপে দুলেছিল আভরণ কত,
সুরভিত-স্নেহরসে জ্বলেছিল স্নিগ্ধ-দীপ শত।
সুবাস-বিবশ বায়ু ফাল্গুনের চন্দ্রালোক-মিশা।
প্রমত্ত করিয়াছিল সে সুন্দরী বাসন্তিকা-নিশা।
সবি হয়েছিল পূর্ণ।—তবু ছিল একটুকু ভুল,—
তব করে ছিল অস্ত্র,—মোর হাতে হার-গাঁথা ফুল।

সে-মিলনে তাই, বন্ধু! হয়েছিল ত্রুটি সুনিশ্চয়,
মাল্যদানই ঘটেছিল, ঘটে নাই হৃদি-বিনিময়।
আজি তাই পাশ-রজ্জু হইয়াছে সে মিলন-হার,
শ্বাস তব রোধিতেছে মোর প্রেম,—বুঝেছি এবার।
যদিও এ পুষ্পমালা একদিন দেহে মনে তব,
অমৃত-রোমাঞ্চময় অনুভূতি এনেছিল নব।
সেই সুখাবেশ যদি হয়ে থাকে আজ তিক্ততা-ই,
সে-কারণে ক্ষোভ লজ্জা মোর কাছে কিছু তব নাই।
যে-বসন্ত গেছে চলে, সে কি কভু পুনরায় ফেরে?—
প্রেম নাহি বাঁধা যায়, হায় বন্ধু! অতীতের জেরে!

গন্ধরাজে গাঁথা ছিল বরণের বরমাল্য গাছি,
সূত্র শুধু রয়ে গেল, ফুল তাব রহিল না বাঁচি।
শৃঙ্খলেরি রূপান্তর আজি যদি হয়ে থাকে তাই
ব্যর্থ তারে কণ্ঠে বহি—বন্ধু! কোন সার্থকতা নাই।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো, খুলে তারে ফেলে দাও প্রিয়!
সে-ই ওর মান্য গণি। এর চেয়ে হবে সহনীয়।
মিথ্যার দুর্বহ-বোঝা মিলনের মাঝে নাহি এনো,
মোর প্রেমে ঈর্ষা-দ্বেষ, ভিক্ষালেশ নাহি সখা জেনো।
আর কারো ভালোবাসা তৃপ্তি যদি দিতে পারে তবে
তারি মালা নিয়ো কণ্ঠে! মোর এই ব্যর্থমালা হবে
সেদিন সার্থক সখা,—তব চিত্তে প্রেম যদি জাগে,
যে-কোনও নারীরে ঘিরি সুগভীর সত্য অনুরাগে।

তুমি যদি পেয়ে থাক তোমার বাঞ্ছিত জনে প্রিয়,
আমি তাহে অকপটে সুকৃতার্থ হয়েছি জানিয়ো।
তোমার শূন্যতা যদি ভরিতে না পেরে থাকি আমি,
সে ক্রটি আমারি, তাই ক্ষমা চাই ম্লানলাজে, স্বামি!
তব মর্মতলে যেবা বহাইলো প্রেম-মন্দাকিনী,—
সে নারী যে কহ হোন্—মোর শ্রদ্ধা-বন্দনীয়া তিনি।
আমার প্রেমের দায়ে মুক্তি দিনু তোমারে গো মিতা,
প্রশান্ত হৃদয়ে আজি। ইতি

তব—ভুল-পরিণীতা।

প্রাণ-তীর্থ-যাত্রী মোরা

প্রাণ-তীর্থ-যাত্রী মোরা গৃহ উদাসীন,—
কলঙ্কের কলরোল ধ্বনিছে পশ্চাতে,
স্নেহশূন্য-স্বজনের গ্লানির সম্পাতে
আজ মোরা অখ্যাতির গৌরবে বিলীন।[১]

সুন্দরের শঙ্খধ্বনি শুনেছি যেদিন,—
শৈল-শৃঙ্গ টলে যথা হিমবাহঘাতে[২]
সর্ব দ্বিধা বাধা লজ্জা ঠেলে দুইহাতে,—[৩]
সাড়া দিছি সে আহ্বানে ভয় কুণ্ঠাহীন।

আনন্দ-পাথেয়ে চলি নবসূর্য পথে,[৪]
হিসাবের গুরুভার নেই মনোরথে।[৫]

যে দেবতা ঊর্ধ্বে ডাকে মাটির মানবে,
কেমনে আসন তাঁর পাতি ধূলা পরে?
যে-প্রেম সঙ্কীর্ণ প্রাণ দিল মুক্ত করে,—
সে-প্রেম কি মূঢ়তার বন্দী হয়ে রবে?

আপনার মাঝে ছিনু

আপনার মাঝে ছিনু আপনারে লয়ে,
কল্পনার স্বপ্নলোকে বচি ইন্দ্রজাল!
সর্ব-দুঃখ সুখাবেগে নির্বিকার হয়ে,
ছায়া-আলো-মায়া-রাজ্যে যাপিতাম কাল।

প্রথম সংস্করণের পাঠ— ১. আজি মোরা অখ্যাতির গৌরবে বিলীন। ২. শৈল-শৃঙ্গ টলে যথা তরঙ্গ সঙ্ঘাতে। ৩. সর্ব দ্বিধা বাধা লজ্জা ঠেলি দুইহাতে। ৪. আনন্দ পাথয় লয়ে চলিয়াছি পথে। ৫. কামনার গুরুভার নাহি মনোরথে।

তুমি এসে দাঁড়াইলে চিত্তদ্বারে মম ;
মর্মে আঁকা রূপরেখা মূর্ত হল যেন
প্রাণচেতনার মন্ত্র স্পর্শে,—প্রিয়তম!
বিস্ময়ে কহিনু—"ওগো, মোর দ্বারে কেন
দাঁড়ালে অতিথি হয়ে? কিছুই তো নাই
মোর চির-শূন্য বুকে!" —কহেছিলে হেসে,
"শূন্যতাই দাও তুমি, তাই লয়ে যাই,
রিক্তকরে ফিরিব না তব দ্বারে এসে।"
শুনিয়া নিঃশেষে দিনু মোর নিঃস্ব-ধন ;
উচ্ছলি উঠিল প্রেম পূর্ণ হয়ে মন।

আত্মীয় কহিছে কেহ

আত্মীয় কহিছে কেহ—"একি রুচি ওর?—
শেষে কিনা—ছি ছি,—" রোষে হয়ে হতবাক্
আর নাহি সরে বাক্য, ঘৃণায় বিভোর!
ক্ষোভে কেহ বলে ধীরে—"ও প্রসঙ্গ থাক!"

কেহ বা শাপিয়া কহে—"কেন মরিল না
এত শিক্ষা দীক্ষা তার এ-ই পরিণাম?"
ওদের ওসব কথা নির্বিকারে শোনা
একান্ত কঠিন, জানি,—তবু ভাবিতাম—
—জীবনে বরিলে ওরা কেন ভয় পায়?
সত্যেরে পূজিলে কেন লজ্জা মানে চিতে?
কাচের পুতুল হয়ে বাঁচিবারে চায়!!
ভুলেতে কি প্রাণ-ধর্ম আছে পৃথিবীতে?

মানুষ গড়িতে চায় ওরা,—পুঁথি খুলে।
—সে পুঁথি যে কে গড়েছে তা গিয়েছে ভুলে!

বিপুল বেদনা-মূল্য

বিপুল বেদনা-মূল্য দিছি বক্ষ চিরে
জীবনের সার্থকতা লভিতে অন্তরে!
আত্মার আত্মীয়ে মোর আনিয়াছি ঘরে
সংসারের সিংহদ্বার খুলি দৃপ্তশিরে।
পূর্ণ করি অভিষেক প্রেম-অশ্রুনীরে,
মুকুট পরায়ে দিছি—রাজদণ্ড করে!
প্রাণ-পীঠে বসায়েছি চিত্ত-অধীশ্বরে
তুচ্ছ করি সবাকার উচ্চ-অখ্যাতিরে।

ফিরায়ে লয়েছে মুখ স্বজন সমাজ,
একেরে লভিতে সবে হারায়েছি আজ।

ধ্যানলোকে তপোভঙ্গ এল মহাক্ষণ!
সৃজন-প্রলয়-লগ্নে কাঁপিছে অন্তর!
বিচ্ছেদের বজ্রে বাজে রতির ক্রন্দন,—
মিলন-আনন্দে উমা হাসিছে সুন্দর।

কঠিন আঘাত সহি

কঠিন আঘাত সহি আজীবন ধরি
ফুল দিছি নিবেদিয়া ছায়াতরু সম,
ছিঁড়েছ মুকুল কলি কিশলয় মম,
তবু মিষ্ট-ফুল দিছি গুচ্ছ-গুচ্ছ ভরি

উজাড়ি ঢালিয়া দিছি চিত্ত মুক্ত করি
অন্তরের স্নেহ প্রেম প্রীতি অনুপম,
জীবনের যাহা কিছু প্রেয় প্রিয়তম—
হে সংসার! দিছি তাহা তব পাত্রোপরি।

তোমার কঠোর তীক্ষ্ণ কুঠারের ঘায়
দীর্ণ এ হিয়ায় ব্যথা লভিয়াছি যত,
ততো মোর মরমের অমৃত-ধারায়
মুছাইয়া দিছি তব সন্তাপ নিয়ত!

আমারে দিয়েছ তুমি বহু দুঃখ রাশি,
নিঠুর! তোমারে আমি তবু ভালোবাসি।

ভালোবাসা অপরাধ

ভালোবাসা অপরাধ হয় যদি—হোক্!
হাসি মুখে দণ্ড তার লব শির পাতি।
ভালোবাসা মোহ শুধু?—শুধু মিথ্যা স্তোক—?
সে মোহেই মগ্ন হয়ে রব দিবা রাতি!

ভালোবাসা ভুলে যায় রীতি-নীতি-জাতি—?
যাক্, তাহে ক্ষতি নাহি, নাহি মানি শোক।
ভালোবাসা—ক্ষণিকের দীপ্ত মায়া-বাতি?—
তবু দগ্ধ হব বরি সেই প্রেমালোক।

ভালো যে বেসেছি—প্রাণ পরিপূর্ণ তায়!
ব্যর্থ বা সার্থক হোক্—কিবা আসে যায়!

দুখ-অশ্রু বেদনায় যদি মম প্রেম
অবসান লভে কভু মরণের বুকে,
তবুও আমি যে আজ ভালোবাসিলেম—
জন্মান্ত সার্থক হবে এরি স্মৃতি সুখে।

মোদের বাসরে নেই

মোদের বাসরে নেই মত্ত-ফাগুনের[১]
মদির সুরভি কিংবা মুগ্ধ-শুক্লারাত![২]
দুঃখের তপস্যা দীপ্ত হোম-আগুনের[৩]
যজ্ঞতলে মিলিয়াছি দোঁহে-দোঁহা সাথে.
চন্দন, কুসুম-মাল্য, মিলনের গান,
উৎসবের বাঁশি, হাসি, আনন্দ-প্রবাহ,
স্বজনের শুভাশিস, প্রীতি-অবদান
আমাদের পরিণয়ে ঢালেনি উৎসাহ।
বিধাতারে সাক্ষী করি ধরি তাঁর হাত
নূতন জীবনপথে চলেছি নির্ভয়ে।[৪]
আসে যদি এ জীবনে দুর্যোগের রাত,
শিরে লয়ে সর্বদুঃখ, চলিব উভয়ে।

প্রথম সংস্করণের পাঠ—১. মোদেব বাসর নাই মত্ত ফাগুনের ২. সুরভিত ফুলবনে মুগ্ধ শুক্লারাতে ৩. নিদাঘের তপঃ দীপ্ত হোম-আগুনের ৪ যাত্রা করিয়াছি আমি একাকী নির্ভয়ে।

চাহি না আত্মীয় প্রিয় চাহি না বান্ধব,
দু-জনে সম্পূর্ণ মোরা একাধারে সব।[৫]

লাভ কিম্বা ক্ষতি এটা

লাভ কিম্বা ক্ষতি এটা,—কাজ কি কযিয়া?—
ভাল মন্দ বিচারেতে নাহি প্রয়োজন।
সমাজ সংসার দোঁহে একান্তে বসিয়া
তুলাদণ্ড ধরি উহা করুক ওজন
যথা ইচ্ছা।—

হে বান্ধবি! মোর রুচি নাই
ওই হেয়-হীনতায়। ততক্ষণ বসি
নির্জন-নদীর তীরে গান যদি গাই
ছায়াতরুতলে, কিম্বা হেরি স্মিত-শশী
শুক্লারাতে দুজনায় ; সার্থক আমার
হবে সেই লগ্ন-টুকু।

যাহার সঙ্কেতে
আপনি পরেছি গাঁথি এ মিলন হার,—
লাভ ক্ষতি সব দিছি তাঁহারি অঙ্কেতে।
খ্যাতি-নিন্দা তাই তুচ্ছ মানি আমি বোন্।
প্রেমের অমৃতে যে রে মগ্ন মোর মন!

তোমারে বাসিয়া ভালো অপমান যত

তোমারে বাসিয়া ভালো, অপমান যত
লভিতেছি ওগো প্রিয়, সেই শ্রেষ্ঠদান
দিতেছে বিধি মোরে। পরম-সম্মান
মানি তাই যত পাই লাঞ্ছনা নিয়ত।

প্রথম সংস্করণের পাঠ— ৫. দু'জনে দোঁহার মোরা একাধারে সব।

তোমারে বাসিয়া ভাল সুখী আমি কত,
কেমনে জানাব বন্ধু? তাহার সন্ধান—
জানে শুধু অন্তর্যামী! ক্ষুদ্র মোর প্রাণ
উথলি উঠিছে সুখে উচ্ছ্বসি সতত।

শুধায়ো না কোনো প্রশ্ন,—শুধু তব হিয়া
রাখি মোর হিয়া পরে লহ তা পড়িয়া!

দুঃখ ব্যথা ক্ষয় ক্ষতি ঘৃণা অপমান
সোনা হয়ে উঠিয়াছে আজি তব প্রেমে,
সার্থক-আনন্দ প্রাণে জাগে অফুরান,
স্বর্গ আসিয়াছে সখা মর্ত্যে যেন নেমে।

সুদীর্ঘ শীতের নিশা

সুদীর্ঘ শীতের নিশা স্বপ্নে ছিল ভরা,—
আরো স্বপ্নতর ছিল প্রিয়-ভুজডোরে
সঘন বেষ্টন খানি। জাগি উঠি ভোরে
ভাবিতেছি এ নিবিড় বাহুপাশে ধরা—
এও নাকি যায় টুটি— বৃন্ত হতে ঝরা
বিকশিত-পুষ্প সম? রজনীর ঘোরে
যা ছিল রঙিন তা কি দিবালোকে মোরে
এনে দিবে দুখ-তপ্ত দুঃস্বপ্ন-পসরা?—

না না—ওগো জাগিব না, এ রজনী-শেষে
চিরনিদ্রা যেতে চাই অন্তহীন-রাত,—
হেন সুখ-স্বপ্ন ভেঙে নির্মম-প্রভাত
আসে না—আসে না যেন অকরুণ বেশে।

ভোরের সুন্দর আলো হেসে যেন কয়
মোর দুটি আঁখি চুমি—'মিথ্যা তব ভয়।'

গভীর নিশীথ রাত্রে

গভীর নিশীথরাত্রে নিদ্রা গেল টুটি—
চেয়ে দেখি শুভ্র আলো বাতায়ন-ফাঁকে
স্বর্গ-মন্দাকিনী সম পড়িতেছে লুটি।
পাপিয়া অশ্রান্তসুরে ডাকে তরুশাখে
বিদরি নিঃশব্দাকাশ। ভাবিলাম মনে
ওর আগে উঠি আজ যাব ফুলবনে।
ফুটন্ত গোলাপকুঞ্জে শিলাসনে বসি
হেরিব উজ্জ্বল ভোরে দীপ্ত-শুক্রতারা ;
মাঘের আহিম হাওয়া পুষ্পগন্ধ শ্বসি
রোমাঞ্চ রচিয়া অঙ্গে হেসে হবে সারা।
সন্তর্পণে ক্ষুদ্র চুমা আঁকি তার মুখে ;
উঠিতেই, —সে কহিল টানি লয়ে বুকে
"—কোথা যাও? এখনো তো হয়নিকো ভোর"
দেখি শুক্রতারা সম হাসে চক্ষু ওর।

ধরণীর ধূলি হতে

ধরণীর ধূলি হতে তুলি মোরে নাথ
কী অমৃত মধুরসে দুখ-পাত্র ভরি
সর্বহারা এ জীবন দিলে পূর্ণ করি?—
ভুলালে সকল ব্যথা—জুড়ালে আঘাত!

আমার গগনে যেন নবীন প্রভাত
দেখা দিল বেদনার সাগর উতরি
সে আলোকে তোমারেই লইয়াছি বরি
নব-তীর্থ-পথে তব ধরিয়াছি হাত!

নিন্দা-সন্দেহের পঙ্ক কলঙ্কের কালি
অঙ্গে মাখি, শিরে লয়ে অখ্যাতির ডালি--
আনন্দে চলেছি আমি ছন্দ রচি সুরে,
সঙ্কীর্ণ সমাজ মোরে ঠেলে দেছে দূরে।

সত্যের সম্মান লাগি ত্যজিলাম সব—
আমার প্রেমের প্রভু, সেই তো গৌরব!

অসময়ে অকস্মাৎ

অসময়ে অকস্মাৎ মোর তনু-তীরে—
তরণী ভিড়াল আসি যেদিন মরণ,
আষাঢ়ের পূর্ব-মেঘ তিমির-বরণ
উষার তরুণ-ভাতি নিল যেন ঘিরে!
ঘন-কৃষ্ণ-ছায়া তার গাঢ় ধূমে ধীরে
আমার আঁখির আলো করিল হরণ ;
সেদিন তুমিও এলে নিঃশব্দ-চরণ।
স্নেহস্পর্শ দিলে মোর অভিশপ্ত শিরে।

আমার দক্ষিণ পাণি তুলে নিল এসে
কালের ভৈরব-দূত ; বাম পাণি তুমি—
ললাটে চুম্বন দিলে—দোঁহে ভালোবেসে ;
তারপর.......ডুবে গেল বিশ্ব-রঙ্গভূমি!

জাগিয়া চাহিয়া দেখি—সে গিয়েছে ফিরে—
মৃত্যু-জিৎ প্রেম একা আছে মোরে ঘিরে!

অর্ধরাতে জেগে দেখি

অর্ধরাতে জেগে দেখি ছায়াচ্ছন্ন-ঘর ;
শিয়রে সে বসি মোর,—চোখে নাহি ঘুম
ললাটে অলকে ধীরে বুলাইছে কর
গাঢ়-স্নেহ-সন্তর্পণে! রজনী নিঝুম।
আবেশে মুদিনু আঁখি,—তার যত্নাদর
স্মরণে জাগাল মোর জননীর স্নেহ ;
যা অভাবে এ অন্তর বেদনা-জর্জর
সে কি আজ এল ফিরে ধরি মায়াদেহ?
আপনার অঙ্গবাস খুলি নিজ হাতে
সর্বাঙ্গ ঢাকিল মোর নিবারিতে শীত,
গভীর-মমতা সনে। রুদ্ধ-আখিপাতে
প্রেম-সুনিবিড় দুটি আখির সম্প্রীত
রোমাঞ্চিত সারা অঙ্গে অনুভব করি
কৃতজ্ঞ আনন্দে মোর অশ্রু পল ঝরি।

আমি যেন অন্তহীন

(মরুবিজয়)

আমি যেন অন্তহীন প্রান্তর বিশাল,—
শ্যাম স্নেহ-আবরণ কোনো অঙ্গে নাহি ;
জ্বালাতপ্ত বক্ষ মেলি ঊর্ধ্বপানে চাহি
, আপনারই মাঝে থাকি একা চিরকাল।[১]

তুমি এলে শূন্য নভে প্রাবৃট উত্তাল[২]
ছায়াঘন আষাঢ়ের মেঘতরী বাহি—
উজ্জীবিলে অবিশ্রান্ত ধারাগীতি গাহি
তাপক্লিষ্ট অচেতন দূর্বাদল-জাল।[৩]

হে বন্ধু! তোমার স্পর্শে মরুচিত্ত মোর
আনন্দে উঠিল গাহি সবুজের জয়!—
গাঢ়-অমা-অন্তে যেন লয়ে শুভ্রভোর
আমার জীবনে তব দিব্য-অভ্যুদয়।

পাষাণে জাগালে তুমি প্রাণের মহিমা।[৪]
বিদগ্ধ-প্রান্তরে হাসে নব-শ্যামলিমা।

নীড় রচি নিরজনে

নীড় রচি নিরজনে আছি দুটি প্রাণী,
বাহিরের কোলাহল কিছু নাহি জানি।
অভিশাপ আশীর্বাদ খ্যাতি নিন্দা যত
কমলপত্রের পরে বর্ষাবারি-মতো
ঝরে আমাদের শিরে। নির্বিকার-হেসে
সবাকার দান নিই শান্ত ভালোবেসে
আনম্র-মস্তকে নিত্য, নিরুদ্বেগচিতে।
পেয়েছি অমৃত যাহা মর-পৃথিবীতে,
সে-আনন্দরসে মগ্ন হয়ে আছে প্রাণ,
জীবন-বীণায় বাজে বিরাটের গান

প্রথম সংস্করণের পাঠ—১. অধীর প্রতীক্ষা লয়ে যাপি দীর্ঘকাল ২. তুমি এলে মেলি নভে কালো কেশজাল ৩. তাপক্লিষ্ট অচেতন মানস মরাল ৪. পাষাণে জাগালে একি প্রাণের মহিমা।

উদার উদাত্তসুরে। দুটি মুগ্ধমন
যুক্ত আজি মুক্ত হয়ে মিথ্যার বন্ধন।
সংসারের নৃশংসতা করে না কাতর ;
খুঁজিয়া পেয়েছি প্রেমে পরশপাথর।

সূর্যাস্তের স্বর্ণরেখা

সূর্যাস্তের স্বর্ণরেখা মিলাল আকাশে ;
ধেনু-কণ্ঠ-ঘণ্টা-ধ্বনি ধীরে ধীরে ক্রমে
দূর হতে দূরান্তরে ক্ষীণ হয়ে আসে!
একটি তারকা একা ফুটিছে সরমে।

গোধূলি-ধূসর এই প্রদোষ-আঁধারে
ভেসে যেন আসে কোন জন্মান্তর-স্মৃতি
ফুটিয়া উঠিতে চাহে টুটিয়া বাধারে
অতীত-কালের অন্ধ আনন্দের গীতি।

উত্তীর্ণ হইয়া যেন ধরণীর সীমা
হৃদয় লভেছে আজি অসীম মহিমা।

আজি মোর চিত্ত লয়ে কাব্য রচা যায়!
ভুলেছে সে গৃহকোণে অবরুদ্ধা-বধূ!
জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপী প্রেমের ব্যথায়
মুক্ত মর্ম-কোষে তার ভরি ওঠে মধু।

বনবিহগী
১৯৩৭

আমার নিভৃতচিত্তে যে ভাবনা করে সঞ্চরণ
অজস্র ঐশ্বর্যভারে আন্দোলিত করিয়া এ মন ;[১]
সে-মহার্ঘ ভাবনার বিচ্ছিন্ন মানিক্যকণা গুলি
ইচ্ছা হয় চয়নিয়া স্বর্ণসূত্রে মাল্য রচি তুলি!
গোধূলির দীপ্তি তারা ক্ষণতরে পশ্চিমের পটে
বিচ্ছুরিয়া বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত হয় অস্ততটে।

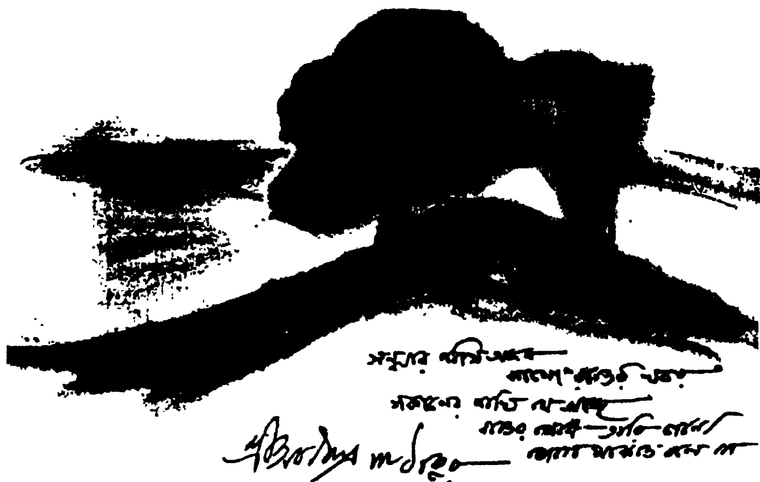
যে-নির্বাক আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত চিত্ত মোর সদা,
স্তব্ধ অনুভূতিলোকে যে-নিবিড় আনন্দ সর্বদা
ভাষার অতীত তীর্থে সংগোপনে আজো গেল রয়ে,—
হে সুন্দর! তব স্পর্শে বাজুক তা মুখরিত হয়ে।
সেচন কর গো বারি অমৃত-ভৃঙ্গার হতে তুমি,[২]
আমার কল্পনা-বীজ অঙ্কুরিয়া উঠুক কুসুমি!

ওগো মোর অপ্রকাশ! প্রকাশিত হও জ্যোতি সহ!
ওঠো ওঠো হে প্রত্যুষ! মৌনরাত্রি হয়েছে দুর্বহ।
তমসার গর্ভ হতে জাগো সূর্য, কোটি রশ্মি পাতে,
আমার কানন ব্যগ্র আলোকের তীব্র প্রত্যাশাতে।
অগণ্য কোরক মোর অন্ধ আঁখি উন্মীলন তরে
নিশীথ প্রহর ব্যাপি নীরবে তোমারে ধ্যান করে।

নিখিলের বক্ষে কাঁদে যে-অজ্ঞাত কামনা অধীর,
উপেক্ষিত রয় বিশ্বে যে-পূজার চন্দন উশীর ;[৩]
উজ্জ্বল হাসির তলে যে অশ্রু তাতলে ফল্গু বহে,[৪]
জীবনের দৃশ্যমঞ্চে যে-মরণ অদৃশ্যই রহে ;—
আমি যেন তারই লাগি দিতে পারি মোর শ্রেষ্ঠ দান,
হৃদয়ের অনুভবে অভিষিক্ত নিঃশব্দের গান।[৫]

প্রথম সংস্করণের পাঠ— ১. অগ্রজ ঐশ্বর্যভারে ঐশ্বর্যিত করিয়া এ মন। ২. সেচন করহ বারি অমৃত-ভৃঙ্গার হতে তুমি। ৩. উপেক্ষিত রয়ে গেল যে পূজার চন্দন উশীর। ৪. উজ্জ্বল হাসির তলে যে অশ্রু ফল্গুসম বলে। ৫. অন্তরের আন্তরিক অনুরাগে অভিষিক্ত গান।

বিস্তারিত হোক মর্মে আকাশের অন্তহীন নীল,
উদাত্ত সংগীত ছন্দে পূর্ণ হোক আমার নিখিল।
বন্ধনের বেদনায় বিধূনিছে পক্ষ থাকি-থাকি
সংকীর্ণ পিঞ্জর মাঝে শৃঙ্খলিত নিরুপায় পাখি।
তবু তার লক্ষ্য যেন চলে দূর দিক্ চক্রবালে,
মেঘ-ঊর্ধ্বে স্বর্ণলোকে অরণ্যের শ্যামস্নিগ্ধ ভালে।



—দুঃখের দুঃসহ হোমানল
যে-প্রেমেরে করে সমুজ্জ্বল,
যে-প্রেম ত্যাগের পরে
আসন রচনা করে,
জীবনে যা ধ্রুব সমুজ্জ্বল,—
জাগে যদি সেই প্রীতি মৃত্তিকার মানবেরে ঘিরি,
—তুচ্ছ করি ফিরায়ো না,—জীবন-দেবতা যাবে ফিরি।

[মা ন স লো ক]

আকাশ ও নীড়

কুসুমপ্রাচীর ঘেরা মোর ছোট আঙিনার মাঝে
হে বৃহৎ, হেথা তুমি রহিয়াছ এত ক্ষুদ্র সাজে!
মিলনের সুধারসে জীবন করিয়া সুখলীন
আলস-লীলায় যবে যাপ হেথা প্রতি নিশিদিন,—
তখন তোমারে যেন পরিপূর্ণ রূপে নাহি পাই,
পরানে গুমরি মোর ওঠে ক্ষুদ্র ব্যথাসিন্ধু তাই।

একদা তোমার দীপ্ত সমুন্নত যেই রূপরাগে
বিস্ময় মনে—আজ তা যে স্বপ্ন সম লাগে।[১]
বিমুগ্ধ হরিণী-মন সেইদিন অরণ্য পাশরি[২]
ছুটেছে অসীমপথে শুনে তব অন্তর বাঁশরি![৩]
আর তো সে-সুর আজ বাজেনাকো, হয়ে গেছে চুপ ;[৪]
অন্তর্হিত কেন সেই ঐশ্বর্য-মণ্ডিত দিব্যরূপ।[৫]

সকরুণ অভিজ্ঞতা এতদিনে সঞ্চিয়াছি তাই,—
কুসুমিত এ আঙিনা নহে-নহে তব নিজ ঠাঁই।
তোমারে রেখেছি বন্দী এই ক্ষুদ্র গৃহগণ্ডি মাঝে,
আপনারে সংকুচিয়া মগ্ন তুমি মোর তুচ্ছ কাজে!
ছোট-ছোট দুঃখ সুখ, ছোট হাসি কান্না ধুলা-খেলা
এ জঞ্জালে ভরিয়াছি তোমার মহার্ঘ দিবা-বেলা।

প্রথম সংস্করণের পাঠ— ১. বিস্ময় মানিয়াছি,—আজি তাই, স্বপ্ন-সম লাগে। ২. বিমুগ্ধ হইয়াছি সেই দিন আপনা পাশরি। ৩. শুনি তব অসীমের সুরে সাধা অন্তর-বাঁশরি! ৪. আর তো সে-সুর, হেথা বাজেনাকো, হয়ে গেছে চুপ। ৫ অন্তর্হিত এবে সেই ঐশ্বর্য-মণ্ডিত বিদ্যরূপ।

আমারি ঘরের ধূলি দ্যুতি করিয়াছে ম্লান তব,
হায় বন্ধু, এ দুঃসহ দুঃখ বল কার কাছে কব?
শক্তিশালী বাহু তব ব্যাপৃত রয়েছে হেথা আজ
সাধিবারে অতি ক্ষীণ অর্থহীন মূল্যহীন কাজ!
গতিবেগ স্তব্ধ তব, দৃষ্টি রুদ্ধ গৃহের প্রাচীরে!
—কুসুমের মকরন্দ জড়ায়েছে মুক্ত মৌমাছিরে!

বনচারী বিহঙ্গের জন্মগত যে-আকৃতি রাজে
দূর-দূরান্তর লোকে উড়িবারে কাজে বা অকাজে—
বাধাহীন দৃপ্ত পাখা মেলি নীল অসীমের কোলে।
—জানি তব প্রাণপক্ষী সেই মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় দোলে।
নব-নব যাত্রাপথে স্বপ্রকাশ শক্তি যার জাগে—
তারে রাখিয়াছি সুপ্ত, সুখনীড়ে তপ্ত অনুরাগে।

আমার মাঝারে যেই সভ্য নারী করিতেছে বাস
পুরুষের পৌরুষেই জেনো তার নিত্য অভিলাষ!
সে বাসিয়াছিল ভালো শক্তিবন্ত শৌর্য তব প্রিয়!
বীর্যবানে সঁপেছিল পরানের প্রেমের অমিয়।
তোমার স্বাধীনরূপ মুক্ত মূর্তি দীপ্ত মহাবল,
ফিরিয়া পাবার লাগি প্রাণ তাই হয়েছে চঞ্চল।

লহ তব বর্ম চর্ম কোদণ্ড কার্মুক তরবারি!
শিরস্ত্রাণ তোল শিরে, দিগ্বিজয়ে হও রণচারী!
তব অশ্বহ্রেষা রবে নভ চিরি, বিদ্যুৎ ফুটুক!
ক্ষিপ্র ক্ষুরাঘাতে তার ধরাবক্ষে অনল ছুটুক!
দিকে-দিকে দেশে-দেশে গ্রহে-গ্রহে কর অভিযান!
—থাক্ নারী গৃহপ্রান্তে রত তব সাধিতে কল্যাণ।

বন্ধুর পাষাণ-ভূমে অগ্নি বালু-রুক্ষ মরুদেশে—
ফুটাও শ্যামল শস্য অনলস কৃষকের বেশে!
দুস্তর সাগর বক্ষে বাণিজ্যে ফিরুক তব তরী,
দূর দুরান্তর হতে আন রত্ন আহরণ করি!
অশ্রান্ত সুদৃঢ় বাহু করুক পর্বত কাটি পথ,—
পৃথিবী বিজয়কল্পে চলুক তোমার জয়রথ।

আকাশ সমুদ্র ধরা বায়ু তেজ করিয়া অধীন
হে অজেয় শক্তিমান, হও মর্ত্য-সিংহাসনাসীন।
গিরিগুহা গহ্বরেতে শ্বাপদসংকুল ঘন বনে
অজানারে জানিবারে কর তপ একান্ত নির্জনে।

মধু পানে তৃপ্ত অলি বনান্তে যদি না যায় চলে,
মৃত্যু তার দুর্নিবার রসজালে পক্ষ লিপ্ত হলে।

যৌবন-বহ্নির তাপ ঘুচাইবে গৃহ তরুচ্ছায়া!
মমতা মাধুরী মোহে রচি দিবে স্বপ্ন-মুগ্ধ মায়া!
ক্লান্ত জীবনের প্রান্তে বেঁধো এসে বিশ্রামের নীড়!
সেথায় রবে না বন্ধু, বাহিরের কোলাহল ভিড়!
মুক্তির বিশাল ক্ষেত্রে বিশ্বের অঙ্গনে তুমি,—জানি
শক্তিরূপে সসম্ভ্রমে একদা ধরিবে মম পাণি।[৬]

জাগৃহি

ওগো মায়াবিনি, মায়াজাল তুমি রচেছিলে যার তরে
সেই জালে আজ আপনি পড়েছ বাঁধা,
নর-কুরঙ্গ ধরিতে যে-ফাঁদ পেতেছিলে নিজ করে
সে-ফাঁদে গুমরে নিজেরি করুণ কাঁদা।
পঞ্চশরের তূণীর ছানিয়া মদনভস্ম দিনে
সম্মোহনের যে-বাণ যতনে বাছিয়া লয়েছ চিনে
সে বাণ বিঁধেছে তোমারি আপন বুকে,—
মোহিত হইয়া মোহিনী গো তাই জড়বৎ আছ সুখে।

যে-আঁখিতে তুমি আঁকিয়া কাজল লিখিছ মোহের ভাষা
কান্না-হাসির ফুটায়েছ আলো-ছায়া,
সে নয়নপটে জ্ঞানদীপ্তির নিভেছে সকল আশা,
নাচিছে কেবল চল-চঞ্চল মায়া।
বৃহৎ বিশ্বে যে-বিরাট কাজ—জ্ঞানের যজ্ঞ চলে
তুমি তো আসন লও নাই আজো সে-সাধনাপীঠতলে,
শুধু রূপসীর গুণ্ঠনখানি খুলে
পুরুষের মনোহরণ লীলায় আপনারে আছ ভুলে।

লীলায়িত তব মেরুদণ্ডটি সরল করিতে শেখো,
উন্নত ঋজু ভঙ্গিতে চলো আজ,
সহজ ভাষায় গৌরবময় জীবনলিপিকা লেখো
খুলে ফেল যত কৃত্রিমতার সাজ।

প্রথম সংস্করণের পাঠ—৬. শক্তিরূপে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিবে মম পাণি।

তোমার মাঝারে ভাল ও মন্দ কঠিন সত্য যাহা,
ছদ্ম কপট ছলনায় আর রেখ না লুকায়ে তাহা,
দেহমন নিয়ে ফাঁদ-পাতা-খেলা ছাড়ো,
তব মানবতা হরিল যাহারা। অস্ত্র তাদের কাড়ো।[১]

প্রেমই যদি হয় চরমকাম্য তোমার জীবন তলে
প্রেমেরি সাধনা মহান করিয়া তোল!
যারে ভালোবাসো তারে বাঁধিও না নানা ছলে আঁখি জলে,
মন ভুলাবার মোহন প্রকৃতি ভোল।
প্রেমাস্পদেরে বাহু-বন্ধনে বন্দী করিয়া—নারি,
কোরো না কেবল তোমাগত প্রাণ গৃহপিঞ্জরচারী,
খোলো জীবনের উদার আকাশ-লোক,—
মুক্তির মাঝে সুস্থ সহজ প্রেমের বিকাশ হোক।

অনুচ্চারিত

তুমি বল নাই বন্ধু এ জীবনে কভু কোন দিন
বক্ষের নিতলে তব কোন্ সিন্ধু আকুলিয়া উঠে!
কী সুরে বাজিছে তব অন্তরের অপ্রকাশ বীণ
মর্মের মালঞ্চে কোন্ কামনা কুসুমলতা ফুটে!—
নয়নে প্রার্থনা নাই, অধরে ছিল না কোন ভাষা
উদাসীর বাঁশি হাতে চলেছিলে পথে চিরদিন,—
আশার নগরপ্রান্তে বাঁধো নাই ক্ষণতরে বাসা,
তোমার বৈরাগীমন ত্যাগের গৈরিকে স্বপ্নলীন।

প্রশান্ত মর্মের তব নিস্তরঙ্গ মমতা ধারায়
ভীরু বনকুসুমের সলাজ কোমল গন্ধ-শ্বাস
কেমনে আনিল বহি এ পাষাণ-প্রাচীরা কারায়?
নীরন্ধ্র আঁধার কক্ষে এল মুক্ত আলোক-আভাস।

কে জানিত লীলাচ্ছলে বসন্তের দুরন্ত বাতাস
জ্বালাইবে পুষ্পশিখা গিরিশৃঙ্গে তুষার ভাঙিয়া,
কে জানিত যোগমগ্ন ধূর্জটিরো ধ্যানের আকাশ
কিশোরী উমার স্বপ্নে প্রেমরাগে উঠিবে রাঙিয়া!

প্রথম সংস্করণের পাঠ—১. তব মানবতা হরিল যে,— নারি! অস্ত্র তাহার কাড়ো

মিলন-মাঙ্গল্য

প্রেমের প্রদীপ জ্বালি আনন্দ অমৃত-গন্ধ-ধূপে
সাজায়ে জীবন-অর্ঘ্য, হে তরুণী! পূজারিণী রূপে
মিলন-মণ্ডপে আজি চলেছ কি শুভ-অভিসারে
যৌবনের জয়লগ্নে বরমাল্যে বরিতে তাহারে
ছিল যাহা এতদিন নিশীথের গোপন-স্বপন!—

তোমার হৃদয়াকাশে উদিত যে কনক-তপন
কোন পূজামন্ত্রে তারে বন্দিবে তা নিজে নাহি জান।
উন্মুখ কমল সম আপনারে বুঝি তাই আন
সৌন্দর্যে মাধুর্যে ভরি। বর্ণ গন্ধ মকরন্দ তব
নিবেদিবে দেবতারে প্রীতির নৈবেদ্য অভিনব?—

প্রথম-দক্ষিণা আজি পরশ কি দেছে সুপ্তপ্রাণে?
তোমার ভুবন খানি ভরিয়াছে জাগরণ-গানে।
মাধব এনেছে মধু, মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ-কাননে,
তাহারি আভাস তব আরক্তিম কপোলে আননে।
স্বপ্নাতুর আঁখিছায়ে, স্বেদসিক্ত ললাট-চন্দনে,
লাজনত তনুদেহে, ঘনকম্প্র বক্ষের স্পন্দনে।

স্বর্ণ-চেলাঞ্চল-প্রান্তে প্রভাত অরুণ-দীপ্ত ঝলে
গোধূলির রক্তরশ্মি জ্বলিছে সীমন্তরেখা-তলে।
সন্ধ্যার সুন্দর তারা আনত নয়নপ্রান্তে জাগে,
অপরূপা তুমি আজি চন্দনে-কুঙ্কুমে-পুষ্পরাগে।

অকলুষা উষাসমা হে কুমারি! পুণ্যক্ষণে এসে
দাড়াও হোমাগ্নি-তীরে জ্যোতির্ময়ী ইন্দিরার বেশে।
তব আবির্ভাবে সতি! দীপ্ত হোক দয়িতের কুল,
যুগল-জীবন হোক প্রেমের প্রসাদ-স্নিগ্ধ ফুল।।

অভ্যুদয়

হৃদয়ের মাঝে উদিল যেদিন—কলঙ্কহীন
চাঁদিমা সম
প্রথম প্রেমের স্বপন মম!

অন্ধ প্রাণের গাঢ় যবনিকা
ধীরে গেল সরি—আলোকের শিখা
বিভাসিত করি তুলিল হৃদয়
কী মনোরম!
—আঁধার জীবনে হল প্রেমোদয়
প্রভাত সম!

রজনীর গাঢ় তিমিরের রাশি—নিমেষে বিনাশি
পূরব পথে—
সূর্য ঝলকে অরুণরথে!
তেমনি মহান্ অপূর্বতর
তমসা ভেদিয়া জ্যোতিনির্ঝর
উৎসার হল আঁধার জীবন-
আকাশ হতে ;
এল নবরূপে নিখিল ভুবন
প্রাণের পথে।

তুষার-শুভ্র তীব্র শীতের—মৃত্যুগীতের
হিমেল-সুরে—
মরমের বীণা ছিল তো পূরে!
নির্মমবেগে উত্তর বায়ু—
শুষিয়া লয়েছে যৌবন আয়ু।
চির-বিবর্ণ মন-বনে সদা
নীহার ঝুরে!
ছিল কুহেলির কান্না একদা
সকল সুরে!

এল বসন্ত,—হিমকুজ্ঝটি গেল টুটি-টুটি,
বহিল ধীরে
দখিনা মলয় কানন ঘিরে!
কচি পল্লবে কিশলয়ে ফুলে
তরুলতা তৃণ ওঠে দুলে-দুলে।
নব ফাগুনের উৎসব ঘটা
হিয়ার তীরে!
কুসুমে-কুসুমে বরণের ছটা
ফুটিল ধীরে!

ঘন মাধুর্যে পুরিল হৃদয়,—প্রাণ তন্ময়
অমৃত রসে।
স্বরগের সুধা পরানে পশে!
এলো আনন্দ সুন্দর বেশে,
সোনার কাঠিটি ছোঁয়াইল হেসে,-
চিরনিদ্রিতা পাতাল-বালার
সুপ্তি খসে,—
প্রেম-প্রসূনের বরণমালার
পরশ রসে।

ভ্রষ্টলগ্ন

হে বিদ্রোহী! আজ এলে নতশির নতজানু হয়ে
অসময়ে স্বস্তিবাণী লয়ে!
শান্তির পতাকা হেরি প্রসারিত তব শুভ্রকেশে,
আসিয়াছ শান্ত নম্রবেশে।
যৌবন তাণ্ডব তব অন্তর্হিত উন্মত্ততা সহ,
জীবনের শূন্যপুরী হইয়াছে বুঝি বা দুর্বহ,
করে লয়ে সন্ধিলিপি প্রত্যাগত আজি তুমি সেথা,
—একদিন আস নাই যেথা!

স্বেচ্ছায় উপেক্ষাভরে ত্যজেছিলে এ সাম্রাজ্যভূমি,
প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি
প্রিয়ার সহজপ্রেম, সুন্দর প্রাণের স্নিগ্ধনীড়!
যে-হাটের হট্টগোল ভিড
তোমারে করিয়াছিল বিমোহিত কোলাহলে তার,
উচ্ছৃঙ্খল উল্লাসের সে-প্রমত্ত উন্মাদনা ভার
জীর্ণচীর সম তোমা ত্যজি আজ গেছে দূরে সরে
জীবনেরে ব্যর্থতায ভরে!

তোমার বসন্ত নিঃস্ব হয নাই আজো?—হতে পারে।
—এসেছ কি তাই মম দ্বারে?
অনাদরে অপমানে গেছে চলে আমার ফাগুন,
বৈশাখের জ্বলন্ত আগুন
ছায়াহীন এ জীবন-প্রান্তরে বর্ষিছে খর-দাহ।

—হে বঞ্চিত! ভোগক্লান্ত! হেথা এসে এবে তুমি চাহ
অতীতের সেই স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমামৃত বারি?
কে জানে সন্ধান আজ তারি?

একদা মন্দিরে মম এসেছিল বসন্তের রাতি!
সুরভি আকুল শত বাতি
জ্বলেছিল জীবনের পুষ্পাকীর্ণ সুরম্যবাসরে।
—সেদিনের আনন্দ-আসরে
তোমারি লাগিয়া পাতা হয়েছিল রাজ-সিংহাসন।
করে বরণের মাল্য কণ্ঠে মুগ্ধ প্রেম-সম্ভাষণ
আমি ছিনু অর্ঘ্য তব অষ্টাদশ বসন্তের ফুলে
নিবেদিত ও-চরণমূলে।

কতবার যড়ঋতু বিবিধ কুসুমগন্ধে ছাওয়া
বৃথাই করেছে আসা-যাওয়া!
আমার অশ্রুর বাষ্পে ম্লান হয়ে গেছে চন্দ্রালোক,
আনন্দ ছেয়েছে তীব্রশোক।
আশার মঞ্জরী মোর বৃন্তচ্ছিন্ন হয়েছে প্রাতেই,
নিঃসঙ্গ করেছি যাত্রা তন্দ্রাহীন তিমির রাতেই,
বন্ধুর এ পথে মোরে তুমিই দিয়েছ বন্ধু ঠেলে ;
—এতকাল পরে আজ এলে!!

মধুঋতু ব্যর্থ মম। অকালেই এসেছে নিদাঘ,--
অগ্নিতপ্ত তার তীব্ররাগ
দগ্ধ করিয়াছে দেহ। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা ঘোর
বিধ্বস্ত করেছে মন মোর।
নব তপস্যায় আজি বসিয়াছি দীপ্ত সূর্য শিরে,
পঞ্চাগ্নির হোমকুণ্ড জ্বলিতেছে চারিপার্শ্বে ঘিরে,
হেথা নাই শীতলতা, প্রীতির আশ্রয় কিছু নাই,
—পুড়ে সব হইয়াছে ছাই।

তোমার আমার যাত্রা একলক্ষ্যে আজি আব নহে!
ভিন্নমুখে চলেছি উভয়ে!
চলে বিপরীত দিকে দুইখানি জীবনের রথ,—
নির্বাচিয়া নিজ-নিজ পথ।
তবুও বিশুষ্ক আঁখি আজো মোর ভরে আসে জলে,
একদা চেয়েছে যারে তারেই ফিরাতে হল বলে!—

দুর্লভ বল্লভ মম দ্বারে এল অকিঞ্চন-বেশে,—
আমার প্রেমের মৃত্যুশেষে।

হয়তো এ স্মৃতি মোর জীবনের শূন্য শুষ্কপাতে
কোনও চৈত্র-পূর্ণিমার রাতে,
ঝিল্লি মুখরিত কোনও কেয়াগন্ধী আষাঢ়ের সাঁঝে
হয়তো বা উদাস অকাজে
রচিবে বিচিত্রলিখা নবরসে নব বর্ণজালে!
কোনও এক নিশান্তের সুপ্তিশেষে অস্ফুট সকালে
তোমার নিরাশা-ম্লান আঁখি দুটি স্মরণে ফুটিবে,
—মৃতপ্রাণ সঞ্জীবি উঠিবে।

নর ও নারী

তোমার কর্মের ক্ষেত্রে আছ যেথা অহরহ মাতি,
ব্যস্ত মন ন্যস্ত নিজ কাজে!
হে বন্ধু, সেথায় তুমি কর নাই মোরে তব সাথী
ডাক নাই সে-ভুবন মাঝে।
আননে বুদ্ধির দীপ্তি, ললাটে চিন্তার দিব্যরেখা,
দুর্জ্ঞেয় সন্ধানে যবে যোগীসম মগ্ন রহ একা,
জটিল সমস্যা মাঝে সমাহিত সেই মূর্তি দেখা
কী মোহ সে কিছু জানি না যে!

হে জ্ঞানী! তোমার জ্ঞান কর্ম মাঝে সমন্বয় লভি
রচে যেথা ধ্যানলব্ধ ফল,—
সেথা তো আপনি তুমি দেখ নাই আপনার ছবি,
অপরূপ সে রূপ উজ্জ্বল!
দুর্গম সুদূরতীর্থে মন্দিরের রত্নবেদী পরে
দূর হতে দেবতারে দেখেছ কি ক্ষণেকের তরে?
দেখেছ সূর্যের দীপ্তি দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে?
চিত্ত তাহে হয়নি বিহ্বল?

দূর হতে শ্রদ্ধাভরে সবিস্ময় গরব-গৌরবে
সসম্ভ্রমে করি নমস্কার!
সমস্ত হৃদয়খানি ভরি ওঠে সৌভাগ্য-সৌরভে
উথলে পুলক-পারাবার!

তোমার সকাল-সন্ধ্যা রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে গানে
সুন্দর করি যে আমি, প্রাণের পরমামৃত দানে,
প্রহরের খরদাহ জুড়াইতে এসো এইখানে
সার্থকতা সেই তো আমার!

হেথায় যখন থাকো প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণে
সে রূপ একান্ত মম চিনা!
প্রশান্ত মুরতি তব ভরি রহে আনন্দ-কিরণে
মুহূর্ত চলে না আমা বিনা!
সন্ধ্যায় সুখের পাত্রে পূর্ণ হয় মাধুর্যের ভার,
মর্মের গোপন হর্মে মুক্ত করি দাও রুদ্ধদ্বার,
সেখানে কেবল শুধু তুমি আমি,—কেহ নাহি আর
ধরণী বাহিরে রহে দীনা!

কাছে এলে ভালোবাসি, কাছে পেলে সুনিবিড় প্রেমে
নিবেদিয়া ধরি মোর সব!
দূর হতে শ্রদ্ধাভরে লভি তব দীপ্যমান ক্ষেমে,
—মনে হয়, তুমি সুদুর্লভ।
জীবন-প্রাঙ্গণ তব সুদূরবিস্তৃত,—তারি মাঝে
আমারে আননি টানি জনতার কোলাহলে কাজে,—
দিয়েছ সেথায় ঠাঁই, যেথা তব সুখ দুখ রাজে ;—
—সেই মম চরম গরব।

উদ্বোধন

ওঠ নারি, বিশ্বরমা, অন্ধ-সিন্ধুতল তেয়াগিয়া
কল্যাণীর বেশে,
নয়নে অমৃত-উৎস, কক্ষে সুধাভাণ্ড ভরি নিয়া
এসো স্নিগ্ধ হেসে।
আজি যে নিখিল-নর তপ্ত-মরু জ্বালা বহি প্রাণে,
আকণ্ঠ-পিপাসা লয়ে সকাতরে তোমারে আহ্বানে,
হে কল্যাণী, প্রাণ-পাত্র ভরো ভরো প্রেম-সুধা দানে
তৃপ্ত করো তৃষা,—
জীবনে নির্মল উষা ফুটুক্ তোমার দিব্যগানে
- টুটি অন্ধ-নিশা।

এসো সুকল্যাণী রূপে সমুজ্জ্বল সিন্দূরের টীকা
আঁকি নম্র-ভালে,
অন্ধকার গৃহপ্রান্তে জ্বালাও মঙ্গলদীপ-শিখা
নিত্য সন্ধ্যাকালে।
ঘন স্নেহে আমন্থর স্নিগ্ধ তব হৃদয়-সমীর
জুড়াইয়া দিক্ আজি নিখিলের দাহতপ্ত-শির ;
নরের ক্রন্দন
নিমেষে হউক স্তব্ধ। তব চিত্ত অমরাবতীর
লভি নিমন্ত্রণ।

জাগো জাগো হে সাবিত্রী, বাঁচাও স্বল্পায়ু স্বামী তব,
সমাগত যম!
নয়নে নামিছে তার মরণের আঁধার নীরব
স্তিমিত নির্মম!
প্রদীপ্ত-সতীত্বতেজে ওগো দৃপ্তা! মৃত্যুরে জিনিয়া
শমনের পাশ হতে আনো আনো প্রিয়রে ছিনিয়া,
হে নারী সবিতৃকন্যা! জেগে ওঠো আপনা চিনিয়া
বিশ্বে সবখানে।
সঞ্জীবিত করো দেবি অটুট অন্তর-শক্তি নিয়া
মৃত-সত্যবানে।

স্বেচ্ছায় ভিক্ষুর কণ্ঠে রাজপুত্রী বরমাল্য দিবে
ত্যজি রত্ন-হেমে,—
হে দক্ষদুহিতা, আজি সন্ন্যাসী শ্মশানচারী শিবে
লহ বরি প্রেমে।
সকল গঞ্জনা গ্লানি তুচ্ছ করি বাধাবিঘ্ন শত
নির্বাচিয়া লহ পতি, হে অপর্ণা! নিজ মনোমত ;
তেজস্বিনী অয়ি!
দশ-মহাবিদ্যা রূপে মহেশে চরণে করো নত,
দৃপ্ত-শক্তিময়ী!

সত্য শিব সুন্দরের অপমান ঘটে বিশ্বে আজ
—এসো এসো সতী!
ত্রিনেত্রে প্রদীপ্ত-বহ্নি, হস্তে শূল, ভৈরবীর সাজ—
এসো ভগবতী!
অশিবের অন্যায়ের অসত্যের প্রতিবাদ তরে
জীবন উৎসর্গী দাও শিবহীন-যজ্ঞ পণ্ড করে

আত্মভোলা আশুতোষ যেন মহারুদ্র রূপ ধরে
মথি মিথ্যা-যাগ,—
অভিজাত-দম্ভ দমি ভূতনাথ আহরে স্ব-করে
যজ্ঞ প্রাপ্যভাগ।

হস্তিনার সভাতলে পৃষ্ঠে লয়ে মুক্ত-মেঘবেণী—
সরোষ নিঃশ্বাসে
ভীষণ প্রতিজ্ঞা পুন নির্ঘোষি উচ্চার যাজ্ঞসেনী,
জ্বলন্ত-বিশ্বাসে।
নারীত্বের অপমান ঘটাল যে-নীচ দুরাচার
তার তপ্ত রক্তরাগে বিরচিবে বেণী পুনর্বার,
পশুরে সংহারী
কুরুক্লিষ্ট আর্যাবর্তে আন গর্ব বীর-দয়িতার,
হে পাণ্ডব নারি!

নিখিল-নরের চিত্তে অপূর্ণতা যাহা কিছু আছে—
ক্ষোভ মনে-মনে ;
হে নারি, তোমারি দ্বারে পূর্ণতার তৃপ্তি তারা যাচে
বিশ্ব-আবর্তনে।
শুধু কন্যা মাতা ভগ্নী শিষ্যা দাসী সখী তুমি নহ,
আরো কিছু—আরো কিছু—ধ্বনি ওঠে বিশ্বে তৃষাবহ,
আপন স্বরূপে জাগি নিখিলের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে রহ
সঞ্চারিয়া প্রাণ ;
আনন্দ জীবন রস দীপ্তি তৃপ্তি বিশ্বে বহি লহ
প্রকৃতির দান।

মন-মর্মর—

আমার জীবন-বীণা বাজুক তোমার করপুটে
রঙ্গে অহরহ!
সকরুণ-সুররাগে পড়ুক ঝরিয়া টুটে-টুটে
দুঃখ যা দুঃসহ!
ঝঙ্কারি উঠুক্ নিত্য চিত্ত ভরি বিচিত্র ভৈরবী
নব-আশাবরী!
ফুটুক্ মর্মের গীতি, প্রীতি-সুমধুর স্বপ্নচ্ছবি,
—কল্পনা-মঞ্জরী!

প্রভাতের পুষ্পবনে স্নেহস্নিগ্ধ শিশির-সম্পাতে
ফুটে ওঠে কলি!
অরুণ আলোক-রাগে জাগে ধরা নব-চেতনাতে
নিশা-সুপ্তি দলি!
অশ্রুগর্ভ সর্বগ্লানি গর্বহীন ব্যর্থ-ব্যথা যত
অকৃতার্থ শোক,
হে মোর দেবতা! তব জ্যোতিস্পর্শে কুহেলির মতো
অন্তর্হিত হোক্।

জীবন-আকাশে প্রাণ ক্ষণ-দীপ্ত খদ্যোতেরি প্রায়
চমকি মিলায়!
অজ্ঞাত স্রোতের ফুল তীর হতে তীরে ভেসে যায়
লহরী-লীলায়!
তারি মাঝে নরনারী প্রেম স্বর্গ রচে ধরণীতে
—কত অশ্রু হাসি!
মৃত্তিকার মর্ত্যতলে মৃত্যুময়ী মায়া-সরণীতে
ভালোবাসাবাসি!

এই স্বপ্নকালে তবু ষড়ঋতু অঞ্জলি ভরিয়া
ষড়ৈশ্বর্য আনে!
অরণ্যে-অরণ্যে পড়ে অমরার অমৃত ঝরিয়া
বিহঙ্গের গান।
গিরিগুহা-গৃহ টুটি ছুটি চলে কল্লোলিনী নদী
নৃত্যরস ধারে!
প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা নিশীথিনী সাজে নিরবধি
রূপ-রত্নহারে।

দিগন্ত-সীমন্তে যবে দিনান্ত পরায় ধীরে এসে
গোধূলি-সিন্দূর,—
সন্ধ্যার সলজ্জ-ছায়া আসে নেমে নববধূ বেশে
—আসন্ন-ইন্দুর
অনিন্দ্য রজত-আভা হাসে যেন তরঙ্গিণী বুকে
সঙ্কোচে শিহরি।
বনান্তে বসন্ত বায়ু ফুলধূলি উড়ায়ে কৌতুকে
সঞ্চরে বিহরি।

আমারো সায়াহ্নলগ্ন কোনোদিন এই সন্ধ্যাসম
হবে কি মধুর?

নবজনমের দূত যবে আসি বার্তা দিবে মম
পরান-বঁধুর!
অগণ্য-আরতি দীপে দিবসের বিরহ ভুলাবে
নক্ষত্র কিরণ।
জীবনের দাবদাহ নিবারিয়া চামর ঢুলাবে
মৃত্যু-সমীরণ!

যাঁর স্নেহ-সুধারসে তৃপ্তি লভি অন্তরে আমার
তীব্র-পিপাসায়।
জাগ্রতের জ্বালাময় দীপ্ত দুঃখ থাকি ভুলে যাঁর
না-বলা ভাষায়!
অদৃশ্য যাঁহার রূপে মানস নয়ন মুগ্ধ মোর
জন্ম-জন্ম ভরি!
তাঁরি করে যেন সর্ব দুঃখ-সুখ ব্যথা অশ্রুলোর
সমর্পণ করি!

জনশূন্য প্রান্তরের দিশাহীন বিস্তৃতির মাঝে
সন্ধ্যার তিমিরে,—
পদচিহ্ন আঁকা পথ ক্ষীণরেখা কোথায় বিরাজে
অন্বেষিয়া ফিরে
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ যথা অচেনা প্রবাসে সঙ্গীহীন ;
—তেমনি জগৎ
অনাদি অনন্তকাল সন্ধানিছে হেথা রাত্রিদিন,—
—'কোথা ধ্রুব-পথ'!

মেলেনি উদ্দেশ আজো আজও যারে কেহ নাহি চিনে,
রচে শুধু নাম!
পরমরহস্যময় অপার্থিব সেই বন্ধু বিনে
বৃথা বাঁচিলাম!
সেই সে না-পাওয়া লাগি অহরহ ঝুরিছে পরান
শূন্যতার মাঝে।
জীবন-বাঁশিতে মোর উদাসীর অশ্রুভরা গান
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বাজে॥



শিল্পী : নন্দলাল বসু

"এই যে নিখিল আকাশ ধরা
এযে তোমায় দিয়ে ভরা
আমার, হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।"
—গীতাঞ্জলি—

[মৃত্তিকালোক]

প্রতীক্ষা

অনাগত উষা আসন্ন—জ্যোতিরাগে
সুপ্তবিহগ চকিত কূজনে জাগে।
তরুণ ভানুর প্রথম পরশ লাগি
উৎকণ্ঠিয়া ওঠে অরণ্য জাগি,—
নব আলোকের প্রেম-আশ্লেষ মাগি
নিথর-পবনে সঘন-কাঁপন লাগে।

কাহার ধেয়ানে স্তম্ভিত মূক ধরা
জপে মনে মনে—'এসো এসো তুমি ত্বরা'!
বিহ্বলা-নদী কোন প্রত্যাশা ভরে
স্বপনশয়নে কথা কয় মৃদুস্বরে,
নিভিছে নীরবে নীহারিকা নভ পরে
সাজে কমলিনী গোপনে—স্বয়ম্বরা!

এসো এসো বীর আঁধার-দুর্গ ভেদি
তব কার্মুকে জড়-তমসারে ছেদি।
বক্ষ পাতিয়া রয়েছে গগন-পথ
কখন আসিবে স্বর্ণ অরুণ-রথ!
অরাজক ভূমে এসো সম্রাটবৎ
ঝলুক্ কালোতে আলোর কনকবেদী।

পার্বতী-পূর্ণিমা

জয়ন্তী পাহাড়ে চাঁদ ধীরে ধীরে উঁকি দিল এসে,
নিঝুম পাইন-বন সহসা উঠিল মুগ্ধ হেসে!
নিঃশব্দ-আবেগ তার অপরূপ আনন্দ ইঙ্গিতে
মূর্ত হলো পত্রে-পত্রে,—ভাষাতীত সৌন্দর্য সংগীতে।
শীর্ণ সরু পত্রজালে জ্যোৎস্নার রুপালি রশ্মিধারা
ঝলসি উঠিল যেন চূর্ণ-চূর্ণ হীরকের পারা।

বৈশাখীপূর্ণিমা-চাঁদ লক্ষ্য ভুলে গিরিশৃঙ্গ পথে
হারায়ে ফেলেছে আজ আপনাকে। তারার সংগতে
কী রাগে গাহিছে গান মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ
অপূর্ব অশ্রুত স্বরে!—শিহরিছে বনের বাতাস।

সে-সংগীত ধ্বনি যেন পশিয়াছে মর্ত্য কিনারায়
নিরজন-শৈলশিরে,—দেওদার পাইনের ছায়ে।
শব্দহীন সে-সংগীতে শৈলে-শৈলে নির্ঝরিণী কুল
অধীর আনন্দাবেগে ফেন-নৃত্যে উন্মত্ত ব্যাকুল।

কুসুমিত তরুচ্ছায়ে শ্যামস্নিগ্ধ আপেলের বনে
পত্র-ঘন শাখে-শাখে আঁধারের চিকণ-লিখনে
জ্যোছনার ভূর্জপাতে ছায়া-কালো অক্ষরের শ্রেণী
কে যেন লিখিছে বসি। বনপুষ্প-প্রসাধিত বেণী
এলায়ে পড়েছে তার গিরিগাত্রে। তাহারি নিঃশ্বাস
সুরভি-মদির করি তুলিয়াছে পার্বত্য বাতাস।
পাইন পল্লবজাল তারি প্রেমে মর্মরায়মান ;
কমলালেবুর বনে অন্ধ বায়ু গাহে তারি গান
সুতীব্র মধুর গন্ধে।—সৌরভ অঞ্জলি ঊর্ধ্বে ধরি
ছুঁড়িয়া ছড়ায়ে দেয় লাভ ক্ষতি ভাবনা বিস্মরি।

হে শুক্লা বৈশাখী-সন্ধ্যা! ওগো মুগ্ধা পৌর্ণমাসী নিশা!
অনবদ্য রূপ তব পূর্ণ যৌবনের জ্যোতি মিশা।
উর্বশী কি তিলোত্তমা ক্লান্ত কি হয়েছে স্বর্গসুখে?
জোছনার ছদ্মে তাই ঝাঁপায়ে পড়েছে গিরি বুকে
আজি সন্ধ্যাকালে। এই পুষ্পাকীর্ণ শ্যাম-শৈল শিরে
স্বর্গের সৌন্দর্য সুধা পূর্ণস্রোতে বহে এল কি রে!
নির্ঝর-কল্লোলে যেন শুনি তাবি হাস্য-কলোচ্ছ্বাস!
তাহারি লাবণ্যধারা প্লাবিয়াছে আকাশ বাতাস ;
প্লাবিয়াছে বন, গিরি, শ্যাম উপত্যকা, উৎস, নদী
দৃষ্টির সম্মুখ হতে অন্তরের অন্তপুর-বধি!

গভীর নিশীথে

গভীর নিশীথে কান পেতে কভু শুনেছ তুমি
অন্ধকারের আকুল কান্না নিশুতি তলে?
স্তব্ধ আকাশে যখন কেবল তারারা জ্বলে,
অন্ধকারের মূক ক্রন্দনে গগন গলে,
অসীম শূন্যে মিশে যায় এই পৃথিবীভূমি!

গভীর নিশীথে অন্ধকারের গহন বনে
আঁখি পাখি দুটি দিয়াছ কি ছাড়ি নিরুদ্দেশে?
কি ফল আহরি এনে দেছে তারা তোমারে শেষে?
সে গহন হতে ফিরিয়াছে পাখি কেঁদে কি হেসে?
অপরূপ কিছু পাওনি তখন মনের কোণে?

গভীর নিশীথে উষ্ণ কোমল শিথানে শুয়ে
অন্ধকারেরে অনুভব তুমি করেছ নাকি?
নিবিড় তাহার নিকষ প্রেমের গোপন রাখী
ঘুম-হারা রাতে পরানে পরিতে আছে কি বাকি?
সকল ভাবনা চেতনারে সে কি যায়নি ছুঁয়ে?

গভীর নিশীথে অন্ধকারের অতল নীরে
ডুবে কি তোমার মরিবার সাধ জাগেনি কভু?
যাওনি কি ভুলে কাহারা ভৃত্য কাহারা প্রভু?
নিচু উচু সব মিশে একাকার ;—ভেবেছ তবু
প্রভাত আলোয় এ অনুভূতিটি পাব কি ফিরে?

গভীর নিশীথে অন্ধকারেরে প্রিয়ার মতো
মুখের নিকটে মুখখানি অতি নিকটে এনে
বুকের মাঝারে পরম হরষে নেছ কি টেনে,
নিবিড় শীতল স্নিগ্ধতা তার দু-হাতে ছেনে
যাওনি কি ভুলে তপ্ত ধরার বেদনা যত?—

গোপনচারিণী

অস্তরাগ-রম্য বিভা মৃদুচ্ছন্দে হতেছে বিলীন
কোটিবর্ণ-বিচিত্র আকাশে। হাসে ম্লান হাসি দিন।
রবি-রথচক্র-বহ্নি নিঃশেষিত শেষ শিখা সহ।
নামে শূন্যমনা সন্ধ্যা বক্ষে বহি বিপুল বিরহ!
নতনেত্রা, অন্তহীন বেদনায় স্তব্ধ শান্ত মূক,
মৌন ম্লান মূর্তি তার ব্যথাতুর করি তোলে বুক
কী যেন অজানা দুখে। উদার উদাস ভাবজাল
অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকে অন্তরের দিক্‌চক্রবাল।
কোন মহা বিরহের ভাষাতীত তীব্র-অনুভূতি
জাগাইয়া তোলে মর্মে মিলনের নিবিড় আকুতি।

জীবনের দীপ্তিহারা সদ্য পরিত্যক্তা বসুন্ধরা,
অরুণ বিচ্ছেদছবি তখনো অন্তরে তার ভরা—
দিগন্তে চাহিয়া আছে আদিত্য-পথের যেথা শেষ
এলায়ে পড়েছে পৃষ্ঠে বিহ্বল কুটিল কালো কেশ।
শ্যামলা তরুণী তন্বী তারি পাশে এলো ত্রস্তপদে,—
জোনাকি উঠিল কাঁপি কিশোরীর নীল পরিচ্ছদে।
কালো আঁখিপাতে ঝরে ঘনস্নিগ্ধ চাহনি গভীর,
উথলে হৃদয়তলে সংগোপন-বিরহ রবির।
আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত অভিসারে চলে,
উজল উদয়তারা সিঁথিমূলে ললাটিকা জ্বলে।
আধ-আলো আধ-ছায়া রহস্য-জড়িতা মনোরমা,
লাজ ভয়ে আকুণ্ঠিতা প্রথম প্রেমিকা বধূ-সমা
দিবা-নিশা সন্ধিক্ষণে সংগোপনে আসে ক্ষণতরে
সূর্যের বিলাসকক্ষে, সরম-সংকোচে দ্বিধাভরে!
পরশি চুমিয়া যায় রবিরাগে আতপ্ত মেদিনী,
দিনান্তের অন্তরালে ভানুর না-দেখা প্রেমার্থিনী।

মৌন-প্রশস্তি

(রবীন্দ্র-জয়ন্তী)

বন্ধু গো! এসেছি মোরা নেহারিতে জয়ন্তী-উৎসব,
এনেছি অঞ্জলি অর্ঘ্যে ভরি!
প্রকৃতির অন্তর্যামী হে কবি! মোদের মৌন-স্তব
জানি তুমি লবে পাঠ করি!
এ আনন্দ-যজ্ঞ তলে আমাদের ডাকে নাই কেহ,
বাতাসে পেয়েছি বার্তা ; শুনি কাঁপে প্রাণ-মন-দেহ
পুলকের শিহরণে ; জাগে মনে তব মুগ্ধ স্নেহ ;
আমরা নহি তো অচেতন—
তুমি তাহা জানো, তাই—মুখর করেনি তব গেহ
মূকের নীরব-নিবেদন!

তন্দ্রামগ্ন ছিনু কবি, অন্ধকার গিরিগুহা-তরে
কত যুগ-যুগান্তর ধরি।
তোমার কিরণ স্পর্শে জাগিয়া উঠেছি কুতূহলে
বিশ্বেরে বিস্ময়স্তব্ধ করি!

আমার কল্লোল-গীতি তব দিব্য-বীণার ঝংকারে
অপূর্ব যৌবনাবেগে উচ্ছ্বসি উঠেছে শতধারে!
ভাঙিয়াছে স্বপ্ন মোর তোমারি আহ্বানে বারেবারে—
খুঁজিয়া পেয়েছি যেন গতি!
নব-ভগীরথ ওগো! লহ্ এই আনিয়াছি দ্বারে
নির্ঝরের নীরব-প্রণতি।

বল বল ওগো বন্ধু! পেরেছ কি চিনিতে আমারে?—
দেখ তো চাহিয়া মোর পানে?—
সপ্তসিন্ধু বক্ষে দুলি তবু তুমি প্রেয়সী পদ্মারে
ভোলনি,—একথা সে যে জানে।
উন্মাদ-পূর্ণিমা আজও অঙ্গে-অঙ্গে মূর্ছি পড়ে মোর,
বেলাহীন বালুচরে চখাচখী কাঁদিছে অঝোর,
তেমনি ঘনায় সন্ধ্যা, আসে নেমে স্বপ্ন-শুভ্র ভোর ;
আমি শুধু দিন গুনি দুখে—
হে পদ্মাবিহারি কবি! জীবনের প্রিয়সঙ্গী মোর
ফিরে কি পাব না আর বুকে?

ধান্যের মঞ্জরী ভরি নৈবেদ্য এনেছি পদে প্রিয়
আমি তব শ্যাম-শস্যক্ষেত!
বন্দিয়াছ ছন্দে গানে যে আনন্দে অনির্বচনীয়
ভুলি নাই আজো সে-সংকেত!
নিদাঘ-দহনে মম শূন্য বক্ষ যবে ধু-ধু জ্বলে,
উত্তীর্ণ হয়েছ হেথা রুদ্র অগ্নি-তপস্যার ছলে,—
সজল শ্রাবণদিনে নীল নব মেঘচ্ছায়াতলে
মাতিয়াছ যেন মত্ত কেকা,—
হেমন্তে শরতে শীতে রেখে গেছ আমার অঞ্চলে
রূপমুগ্ধ কত গীত-লেখা।

আমরা এসেছি সখা তোমারে অঞ্জলি দিতে আজ,
নাহি সাজ—নাহি জয়রোল!
কম্পিত চরণে এসে দাঁড়ায়েছি কুণ্ঠিত সলাজ
তব প্রেম বক্ষে দিল দোল!
'মোরা গ্রাম্য বেণুকুঞ্জ'—'বরষার আমি নদীতট'
'প্রান্তরনিবাসী আমি ছায়াঘন সেই বৃদ্ধ বট!'
'আমি স্বচ্ছ পল্লীদীঘি'—হে কবি, যাদের চিত্রপট
এঁকেছ এমন রমণীয়,

এনেছি আদরে মোরা মরমের প্রীতিপূর্ণ ঘট,—
স্নেহ হেসে নিয়ো বন্ধু নিয়ো।

আমারে চিনিতে কবি বিলম্ব হবে না তব জানি,
বড় ভালোবাসো মোর হাসি!
ফেনশুভ্র করে দিই শরতের উত্তরীয় খানি
যেদিন বাজাও তুমি বাঁশি!
তোমার মুরলীরবে বাহিরিয়া আসি আমি 'কাশ'!—
'—আমি দীন দূর্বা,—তবু আমারেও করেছ প্রকাশ!
তোমার সম্মানে সখা বক্ষে আজ উথলে উল্লাস!—'
'এসেছি গো মোরা ঝরাপাতা!
অখ্যাত আছিনু কাব্যে কত দীর্ঘ যুগ-বর্ষ-মাস
মরমি! মোদের তুমি ত্রাতা।'

'হে বন-বিলাসী কবি! এনেছি মুকুলগুচ্ছ মোর
ফাল্গুনের আম্রবন আমি।
মত্ত মৌমাছির মতো গন্ধে যার হয়েছ বিভোর
লহ তার সুরভি প্রণামি।
—এসেছে খর্জুর শাল, পল্লব-ব্যজনী করে তাল,
মহুয়া মদিরামত্ত, দেওদার সুদীর্ঘ বিশাল,
হরিতকী, আমলকী, নারিকেল এসেছে তমাল—
নিবেদিতে আনন্দ-বারতা ;
সমুদ্র সন্তরি এল পুষ্পে রচি রঙের মশাল,
তুষার দেশের তরুলতা!'

দরদী গো! দীনা আমি রূপহীনা,—কারো যোগ্য নয়,
চাহে নাই কেহ মোর পানে!
একদা নির্জন সাঁঝে—পথমাঝে নিলে পরিচয়
কী গান গাহিলে কানে কানে!
অনাদৃতা আকন্দের ছন্দে কভু ছিল না প্রবেশ,
তুমি বন্ধু, বুঝেছিলে দুখিনীর মূক-মর্মক্লেশ,
পূর্ণ করি দিলে তাই বঞ্চিতার অন্তর প্রদেশ,
সার্থক করিলে তার প্রাণ ;
অবজ্ঞাতা আকন্দের সকৃতজ্ঞ আনন্দ-আবেশ
এনেছি চরণে দিতে দান।

জয়ন্তী-উৎসবে তব বন্দনায় এল সবে মাতি
—শেফালি বকুল গন্ধরাজ,

কদম্ব কেতকী কুন্দ করবী কাঞ্চন যূথী জাতি
পুলক ধরে না বুকে আজ!
মালতী মল্লিকা এল, চামেলি পারুল সন্ধ্যামা
আসিল রজনীগন্ধা সুগন্ধের নূপুর নিক্কণি
নলিনী মেলিল আঁখি, এল ছুটে সৌরভের খনি—
কামিনী গোলাপ চম্পা হেনা ;
অনামা আরণ্যপুষ্প,—অনাঘ্রাতা ইন্দুনিভাননী
বিদেশিনী এসেছে অচেনা।

সসাগরা বসুন্ধরা চরাচর এ বিশ্বপ্রকৃতি
অর্চনার সাজাইয়া ডালা,
এনেছে কবির দ্বারে প্রাণের নীরব স্তুতিগীতি
তোমার অমর-বরমালা!
উর্বশী অলক্ষ্যে দিল প্রণামী পাঠায়ে পারিজাতে,
শুভ্রমেঘে মহাশ্বেতা উপহার ভেটিল সভাতে,
আপনি জননী বাণী তোমার ললাটে নিজ হাতে
জয়টিকা পরাল গৌরবে!
অমূর্ত আনন্দঅর্ঘ অজস্র এসেছে আজি প্রাতে
অপরূপ অমৃত সৌরভে।

আমি মনে ভাবি তাই তব যোগ্য পূজা উপচার
কী দিয়া রচিব নাহি জানি!
আকাশ বাতাস আলো শ্যামা ধরা যাঁর অর্ঘ্যভার
পদপ্রান্তে বহি দিল আনি।
মুগ্ধ মূক প্রকৃতির কণ্ঠে শুনি মৌন জয়গান
অন্তর নিতলে মোর অনুরণি ওঠে তারি তান,
হে কুহকি কবি! বলো কী অঞ্জলি দিব আজি দান
ধরাপূজ্য ও দুটি চরণে,
—তোমার প্রতিভামুগ্ধ আমার মর্মের স্তুতিগান
নিবেদিনু উৎসবের ক্ষণে।

নীল আকাশ

মেদুল মেঘের ম্লান ধূসর গুণ্ঠনখানি খুলি
নির্মল মাধুরী-মুগ্ধ আনন্দিত নীল-আঁখি তুলি
কে তাকালো ধরা পানে এ সুন্দর শারদ প্রভাতে?–
রবিকর-বিরহিণী অশ্রুম্লানা ধরিত্রীর সাথে
হল দৃষ্টি বিনিময় প্রেমপূর্ণ পুলক-ভঙ্গিতে।
মুহূর্তে উঠিল রণি প্রত্যাসন্ন আশার সংগীতে
শোকাচ্ছন্ন বসুধার নৈরাশ্যের নিরুজ্জ্বল দিন ;
শরতের শুভস্পর্শে জ্যোতির্ময হল সে নবীন।
স্বচ্ছ নভো নীলিমায় নব রৌদ্র ভাতিল উজ্জ্বল,
নীলাভ্র ভৃঙ্গারে যেন স্বর্ণ সুরা করে টলমল।

শিশির বিন্দু

নিশান্তে পথের প্রান্তে শ্যামশষ্প তৃণ-শীর্ষে দুলি
নিঃশব্দ উল্লাসে খেলে উতরোল কচি শিশুগুলি!
পল্লবিত শাখে-শাখে সদ্য ফোটা ফুল্ল ফুলদলে
সপ্তবর্ণ রত্ন আভা বিকির্নিয়া হাসে কুতূহলে।
ধরণীর শ্যামবক্ষে কে পরাল লক্ষ মোতিহার?
সুস্নিগ্ধ শীতল তনু খরোজ্জ্বল-তবু সুকুমার।
নিশার অলকচ্যুত অমরাবতীর জ্যোতিকণা
শিশির-নিহার হারে মর্ত্যে যেন দিল আলিপনা!

শিউলি ফুল

মূর্তিমতী মায়া তুমি,—শরতের হে শেফালি ফুল!
স্নিগ্ধ সকরুণবাসে চিত্ত করো বিধুর ব্যাকুল।
হারানো বন্ধুর লাগি হৃদয়ে আকুল ব্যথা জাগে।
অকারণে সকরুণ বিরহবেদনা মর্মে লাগে।
শীতল শিশির-সিক্ত শুভ্রতনু তাই কিগো ঝরে
না-পাওয়া বঁধুর লাগি রাত্রিশেষে মৃত্তিকার পরে?
সলজ্জ-সৌরভে তব কৈশোরের সুখস্বপ্নাভাস,
উদাসীর চিত্তে যেন অতীতস্মৃতির দীর্ঘশ্বাস।

সোনালী রৌদ্র

বারিসিক্ত বনানীর সাশ্রুনেত্রে কে ফুটালো হাসি?
অদৃশ্য বীণায় কার হিরণ্ময় সুর আসে ভাসি?
ধনীর প্রাসাদচূড়ে দরিদ্রের জীর্ণ আঙিনায়
সমান দাক্ষিণ্যভরে স্বর্ণধারা কে আজি বিলায়?
মাঠে ঘাটে নদীস্রোতে তালিবনে নারিকেল-শিরে
ঝিকিমিকি নৃত্যে কেবা নব-রবি-বার্তা লয়ে ফিরে?
সোনালি শারদ রৌদ্রে মাধুর্যের মুক্ত সঞ্চরণ,—
কনক-কিরণ রাগে ধরিত্রীর কান্তি-প্রসাধন।

স্থলপদ্ম

গোলাপেরো রূপগর্ব টুটায়েছ কঠিন আঘাতে,
হে থলকমল রানী! তোমার সুন্দর নেত্রপাতে
কানন-লক্ষ্মীর অঙ্গে উথলিল লাবণ্যের ধারা
ঈষদ্‌রক্তিম রাগে,—লজ্জানতা নবোঢ়াব পারা।
পুঞ্জ-পুঞ্জ পুষ্পভারে আশ্বিনের অঙ্গরাগ করি
সবুজবনের বক্ষে বর্ণ-বন্যা এনেছ সুন্দরি!
অরুণ-অধরস্পর্শে তোমার কপোল হল লাল,—
মৃত্তিকার পদ্ম নাম তাইতো পেয়েছ চিরকাল।

কাশবন

বলাকার পক্ষ সম লঘু মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ,
তারি সনে শ্যামাঙ্গনে কে রচিল শ্বেত অনুপ্রাস?
দুরন্ত প্রাবৃটে যেন প্রেমডোরে করিয়া বন্ধন
সবুজ মেদিনীতলে সহাস্য উছল কাশবন।
কার্পাস-কেশর কোটি স্তবকে-স্তবকে ওঠে দুলি,
যেন ঊর্মি ফেনারাশি মত্তহাসি উঠিতেছে ফুলি।
শান্তির পতাকা শুভ্র সহস্রশিখায় মাঠে ওড়ে!
শরতের আগমনী উল্লাসে জানায় করযোড়ে।

কাঁচা ধান

নব-দুর্বাদলশ্যাম অঙ্গবাস রঙ্গভঙ্গে মেলা—
বিরাট প্রান্তর জুড়ি কে কিশোরী করে মুগ্ধ খেলা
রৌদ্র মেঘচ্ছায়া সনে সারা বেলা উল্লাস-হিল্লোলে?
চঞ্চল সমীরে তার অঞ্চলে সাগর উর্মি দোলে।
রাখালিয়া বেণু বাজে মেঠোসুরে গোচারণ মাঠে,
অরণ্যের আঙিনায় হরিত-হিরণ্য ঘেরা বাটে।
প্রসন্ন পল্লীর নেত্রে কে আঁকিছে সুখ-স্বপ্নচ্ছবি?
ধরণী ঐশ্বর্যময়ী,—ইন্দিরার পাদস্পর্শ লভি।

রক্তকমল

কূলপূর্ণ সরসীর স্ফটিক দর্পণ তলে তুমি
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রাগে খররৌদ্রে উঠিলে কুসুমি।
ব্যাকুল বাতাস বলে,—সুন্দরী! সুরভিদ্বার খোলো!
পরাগবিহুল মুগ্ধ ভৃঙ্গদল মধুমত্ত হল।
বারিবক্ষে আছ, তবু—তোমারে স্পর্শিতে নারে বারি ;
বরতনু খানি ঘেরি দোলে তাই অশ্রুবিন্দু তারি।
শারদলক্ষ্মীর তুমি আসন সাজালে নিজ ফুলে!
সূর্যের সৌন্দর্য-স্বপ্নে মগ্ন আছ সারা বিশ্ব ভুলে।

হংসবলাকা

নীল চন্দ্রাতপ তলে শ্বেত শতদলে রচি মালা
কে দিল দুলায়ে?—বুঝি, অন্যমনা কোন দেববালা
আপনার করধৃত পারিজাতহার হতে খুলি
আনন্দবিহ্বল-মনে ফুল ছিঁড়ে ছড়াইল ভুলি।
হে হংসবলাকামালা! শরতের হে সুন্দর দূত!
আকাশ ধরণী মাঝে একি ছবি রচিলে অদ্ভুত!
তব পক্ষ সঞ্চালনে গতির উন্মুক্ত রূপ হেরি
লোকে-লোকে যাত্রা লাগি কাঁদে চিত্ত—আরো কত দেরি?-

নির্যাতিতার কাহিনী

স্বামি! প্রিয়তম!...নারীর দেবতা!...আমার হৃদয়-রাজ!
উঃ, বড় জ্বালা! ভীষণ আগুন জ্বলিছে বুকের মাঝ!
তুঁষের আগুন এ অনল চেয়ে ঢের সুশীতল মানি ;
বড় যন্ত্রণা! যায় বুঝি প্রাণ!...,সাবা দেহ দাহ গ্লানি!
ওগো তুমি এস—একবার কাছে—জীবনের দুখ-হারী,
তোমার অভয়-কর-পরশনে এ জ্বালা জুড়াতে পারি!
ওই মুখ আর ওরি ছাঁদে গড়া কচিমুখ দুইখানি,
বৈতরণীর তীর হতে মোরে ফিরায়ে এনেছে টানি।
ওগো প্রাণ-প্রিয়, জীবনারাধ্য একবার এস কাছে,
বুকের মানিক খোকা খুকী মোর নিয়ে এস কোথা আছে?
এ শরীর যেন প্রাণহীন জড় শব সম মনে হয়,
ঘৃণাকুঞ্চিত অন্তর মোর, সারা দেহ পূতিময় ;
মর্মকোষে যে শতেক নাগিনী দংশিছে ক্রূরফণা,
শান্তি ওষধি-প্রলেপ তোমারি চরণ-ধূলির কণা!
মণি আর টুনু দুটি যাদু মোর, ঘুমিয়ে কি তারা আছে?
মা বলিয়া ছুটে কেন গো এখনও ঝাঁপায়ে এল না কাছে?
মণিরে আমার এনে দাও ওগো, চুমা দিই তার মুখে,—
টুনুয়ানী—কোথা—দাও এনে দাও একবার নিই বুকে।
মরে যাই ষাট্! বাছারা আমার কত না পেয়েছে দুখ,
মায়ের অভাবে কত না কেঁদেছে, বিষাদ-মলিন মুখ।

* * *

এসো, কাছে এসো, দূরে কেন অত? কেন গো আনত শিরে?
এখনও কেন গো বিবর্ণ মুখ? পেয়েছ তো মোরে ফিরে!
আমার বিরহ-বেদনা তুমি যে সহিতে পার না কভু ;
মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে—তাই মরিতে পারিনি প্রভু!
মরণের কালো যবনিকা-আড়ে চলে গেলে যে গো জানি
মণি ও টুনুরে পাব না কো আর, পাব না ও পা দুখানি।

সপ্ত-স্বরগ-শ্রেষ্ঠ আমার ও দুটি চরণ-তল
ছেলে দুটি ফেলে গোলোকেও গেলে শান্তি পাব না পল!
এই তো আমার প্রথম প্রভাত, এই তো জীবন শুরু,
কল্পনা তুলি কত সাধ আশা আঁকিতেছে লঘু গুরু!
...উঃ! বড় তৃষা এক ফোঁটা হল দাও গো শুষ্ক তালু,
বুকের মাঝারে মরু-দহনের জ্বলিছে তপ্ত বালু।

* *

ও কি কথা? ওগো, ও কি কথা কও—কোথায় যাইব আমি?
করিতেছ মোরে পরীক্ষা এ কি? মার্জনা কর স্বামী?
ভগ্ন চূর্ণ বুকের পাঁজর সহন ক্ষমতা নাই,
বড় দুর্বল, বড় অসহায়, তব আশ্রয় চাই।
আমি যে কী তাহা জান না কি তুমি? জীবন আছ যে ছেয়ে,
তুমি চিরদিন জান বেশি ভালো আমারে আমার চেয়ে।
স্বেচ্ছায় আমি যাইনি বিপথে, মনে প্রাণে আমি সতী,
তব বাহু-পাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সে তো সবই জান পতি!
অস্ত্র-গভীর ক্ষতমুখে আর হেনো না তীক্ষ্ণ বাণ,
ব্যথা অপমান যাতনা সরমে ভাঙিয়া পড়িয়ে প্রাণ।
—সমাজ-ত্যক্তা পতিতা হয়েছি? ওগো স্বামি, বলো তবে,
পত্নী-তোমার কোন্ আশ্রয়ে কার কাছে আজি রবে?
কুল গেছে মোর? নহি কুলবধূ? অকূলে ভাসিতে হবে?
পতিতা-পরশে জাতি-নাশ-তাই গৃহে আর নাহি লবে?
সংসারে মোর দেনা-পাওনার চুকে গেছে সব দাবি?
পথে নেমে আজ খুঁজে নিতে হবে হারানো ঘরের চাবি?
হিন্দু গৃহের বধূ যে গো আমি, রক্ষক তুমি তার ;
দেবব্রাহ্মণ অগ্নি-সমীপে ভর্তা হয়েছ যার,
অর্ধাঙ্গিণী সহধর্মিণী এই বলে নিলে যারে,
মৃত্যু ও যেই মিলন-গ্রন্থি টুটিবারে নাহি পারে ;
আজি সে তোমার কেহ নয়? ওগো, সম্ভবপর একি?
মোর আঁখিপরে আঁখি মিলাইয়া একবার চাহ দেখি!
তব পুত্রের জননী যে আমি, মণি ও টুনুর মা—
গৃহের একটি কোণেও কি আজ ঠাঁই মোর মিলিবে না?

এত অনুনয়, এত ক্রন্দনে, গলিল না তবু প্রাণ?
না না থাক্! মোর ঘুচিয়াছে ভ্রম, চাহি না করুণাদান।

পুরুষের দয়া কৃপা যে ঘৃণ্য আজিকে আমার কাছে—
দিলেও লব না তোমাদের দান, ওতে মহাপাপ আছে!
দুর্বলা এক অসহায়া নারী ধর্ষিতা আজি হায়,
পুরুষ-পশুর পাশর পীড়নে জীবন্মৃতেরই প্রায়,
তারে কি না আজ পঙ্গু সমাজ শাস্তি দিবার তরে
নির্বাসনের দন্ড তুলেছে উদ্যত দুই করে!
অনলে কি নাই দাহিকা শক্তি, মেঘে কি বজ্র নাই,
ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, পুড়ে কি হয়েছে ছাই?
বিনা অপরাধে আমারেই আজ দিতেছ দন্ড সবে!
দন্ড ন্যায়ত প্রাপ্য কাদের?—সে কথা কে আজি কবে?
পশুর কবল হইতে নিজের ধর্মপত্নী যেই
পুরুষ হইয়া রক্ষিতে নারে, ধিক্কার তারে দেই!
ধর্মসমাজ লোক সমক্ষে রক্ষণভার নিয়া
রক্ষিতে নারে পত্নী যাহারা নিজ হাতে আগুলিয়া ;
তাহারা কি নহে অপরাধী বেশি? তাদের কি সাজা নেই?
আমিই কেবল ঘৃণ্য সবার! আমাকেই দূর ছাই?
জাতি ও সমাজ-চ্যুতা করিতেছ, গৃহে আর নাহি লবে!
মোর অপরাধ তাহাদেব চেয়ে গুরুতর কি গো তবে?
স্বেচ্ছায় আমি বিপথে যাইনি লালসা বৃত্তি নিয়া,
স্বেচ্ছায় আমি আসি নি এ দেহ পশুর কবলে দিয়া
স্বেচ্ছায় আমি স্বামি-পুত্রের করিনি তো হেঁটমুখ
পুরুষেই মোরে জোর করে আজ দিয়েছে চরম দুখ!
শত অবৈধ পাপে ও পুরুষ নহে পাপী অনাচারী!
হায়, তাহাদেরই খোস্-খোয়ালের-খেলনা কি শুধু নারী?
শুধু আমাদেরই সমুখে রুদ্ধ হিন্দু-সমাজ-দ্বার?
মৃত্যু অথবা নরক ব্যতীত পাব না কি পথ আর?

ভারতবর্ষ পত্রিকা
(শিরোনাম : মাতৃমঙ্গল)
পৌষ ১৩৩১

অপরাজিতা দেবীর
কবিতা

জন্মদিন

নট্‌কনা রং কাশ্মীরী শাড়ি?—না না, ওটা তুলে রাখো ;
ও ভাই বউদি! এসো না—লক্ষ্মী! একটু এখানে থাকো!
কোন্ শাড়ি আর ব্লাউজে আমাকে সব্‌চে মানাবে ভালো,
বলো না এদের,—দাঁড়া না মালতী!...বাদামি কিম্বা কালো
চেরি-ফুল-তোলা ফিনফিনে ঐ জর্জেট স্যুট?—ছি ছি!
তোমারো কি ভাই মোটে রুচি নেই?—আর্ট শেখা মিছিমিছি!
কী বললি বেলা? রুপোলি জরির লাল বেনারসী যেটা?
আরে রাম! রাম!! হাসবে সবাই, ভাব্‌বে 'মেড়ুয়া' এটা।
সেজদি কী বলে?...কাঁচা-ধানি রং মাদ্রাজিখানি বেশ?
—তোমরা দেখছি সাজাবে আমাকে ঝাড়ুদার-বউ শেষ!
কাঁচা-ধানি শাড়ি দো-ফের্‌তা পরে 'পিরু' ধাঙড়ের মেয়ে
ঝাঁটা হাতে রোজ ঝাড়ু দিতে আসে দেখোনি কি কেউ চেয়ে?
বলো না রাঙাদি!...কী যে হাসো খালি! বেলা আর বেশি নেই,
গা ধোবো কখন?—চুল বাঁধা বাকি!—যাকগে! থাকুক এই।
যাই হল্-এ চলে—হাসুক সবাই,—'পাগলি' ভাবুক দেখে—
আমার কী বলো? শোনাবে সকলে তোমাদেরি ডেকে-ডেকে।

(স্বগত)

দূর হোক ছাই! এতগুলো মেয়ে—পছন্দ নেই কারো!
সুরুচির ধার ধারে নাকি কেউ? বললে না একেবারো—
'সাঁচ্চার সরু ঢালা-জরি-পাড় স্নিগ্ধ সুনীল-শাড়ি
ঐখানি পরো।'—সারা হল সব ঘেঁটে মিছে আলমারি!
সমীর সেনের যা-ফাইন টেস্ট্!—রুচি যা সূক্ষ্ম তাঁর—
তিনি আসছেন,—বেশভূষা আজ ভালো হওয়া দরকার!
মুক্তার সরু একাবলী-হাল, চুনির কাঁকন জোড়া,
কমল-হীরার দুল দুটি কানে, হাসনু-হেনার তোড়া।
মীনে-করা ব্রোচে,—সোনালি-তারায় এলো-খোঁপা বেঁধে নিয়ে,
একছড়া শুধু বকুল ফুলের মালা তাতে ঘিরে দিয়ে

হল্-এ যাবো আজ,—সেই বেশ সাজ! যা খুশি বলুক ওরা,
তাঁর চোখে লাগে কী-ভালো, না-ভালো—কী জানিস তার তোরা?
নীল সাগরের ঢেউয়ের মতন ঘন-নীল শাড়িখানি
সেদিন যে তাঁর মনে ধরেছিল—সে কথাটি আমি জানি।
সোনালি-সুনীল-লাল-জেল্লার ব্লাউজটা গায়ে দেখে
মুগ্ধের মত চেয়ে-চেয়ে তিনি শুধালেন শেষে ডেকে—
'কোন্ স্বপনের সাগরিকা সেজে এলে আজ তুমি ইলা?—
অঙ্গে তোমার তোলে তরঙ্গ গোধূলি-আলোর লীলা!'

(প্রকাশ্যে)

গোটা লো মালতী, জটলা তোদের—হাসি-তামাশার মেলা,—
সর্ দেখি সব ; চুল বেঁধে নিই! গড়িয়ে এসেছে বেলা!
তোল্ বেনারসী—জড়োয়া গহনা—কিছু আমি পরবো না ;
কে আর আসছে মহারথী বল্—সবাই তো চেনাশোনা।
স্বয়ম্বরের সভাতে কি যাবো?...বিয়ের বাসরও নয় ;
জন্মতিথির উৎসব ভাই!—আজ শুধু জন-কয়
অতি-ঘনিষ্ঠ স্বজন বন্ধু করেছি নিমন্ত্রণ ;
সাদাসিধে সাজই শেষ হলে বাঁচি! পড়ে আছে আয়োজন!

দেখ্ না ছোড়দি, হল্ঘরখানা সাজানো হয়েছে কিনা?
গোলাপের 'ব্যোকে' মালীটা এখনো আনেনি কি?—হ্যাঁরে বীণা?
বেহালা সেতার এস্রাজ কটা ও-ঘরে নে যা না ভাই,—
নিজের জন্মতিথি-উৎসব—নিজে কত সামলাই?
সাধে কি তোদের ফরমাজ্ করি, যা না ভাই, তাড়াতাড়ি ;
তোদের সাজ তো হয়ে গেছে, আর করিস্‌নে বাড়াবাড়ি!
ছেড়ে দে আমায়,—চুপ্!...ঐ বুঝি ডাকে দাদা,—থাম্! শুনি—
ও ভাই বউদি বলো গিয়ে—'ইলা এল বলে এক্ষনি—!'
পাঁচটা যে হল!—এল না এখনো...ভুলে গেল নাকি কাজে?
না-না, সে এখনি আসবেই ঠিক ;—ওই তার 'হর্ন্' বাজে—
হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়...সেই এল বটে!—একি! কেন কাঁপে বুক?
মনের কথাটি ধরে যদি ফেলে?—কী করে দেখাবো মুখ!
কী বলে কথার উত্তর দেব—সে এসে দাঁড়ালে কাছে?—
ততো করে ভয়—যত আনন্দ ঢেউ তুলে বুকে নাচে!
গান যদি বলে শোনাতে সে নিজে!—কেটে যাবে না তো তাল?
কিছুতে গেল না সংকোচটুকু! ছিছি, একি জঞ্জাল!
মুখ তুলে আজো পারিনি কখনো দেখে নিতে ভালো করে—
লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠি—চোখোচোখি হলে পরে!

যদি কিছু আজ বলে সে স্পষ্ট! হাতখানি যদি ধরে?—
বিহ্বল হয়ে পড়ে তো যাব না? প্রাণ যে কেমন করে!...
তার উপহার লেগেছে আমার সবার চাইতে ভালো।
আজকের এই উৎসবে ওগো সেই তো আমার আলো!

কলেজ-বোর্ডিং

সাঁঝ থেকে আজ মাথা ধরে আছে, লাগছে না কিছু ভালো ;
আভা বুঝি-তাই তেড়ে এসে ভাই জ্বেলে দিলি সব আলো?
প্লীজ্—আভা, তুই নেবারে লাইট—বেড়ে গেল চোখ-জ্বালা!
অফ্ করে দিয়ে সুইচ্ এখুনি এ রুম্-টি ছেড়ে পালা!
হেনাদের রুমে দে না গিয়ে হানা,—এখানে হবে না পড়া,—
কী বললি তুই... নতুন টীচার্ মিস রায় ভারি কড়া?...
হলেই বা, ঈশ্! বয়ে গেল বড়!...কেয়ার্ করিনে তাঁকে,
অসুখ করেচে বললেই হবে!...ডাক্তার যদি ডাকে?—
ভয় কিরে আভা? ডাকুক, আমিও ফেন্ট হয়ে যাবো ঠিক,
স্মেলিংসল্টে হবেনাকো কিছু ; মাথায় বরফ দিক্
তবে যদি আমি চোখ খুলে চাই!—সহজে কি পার পায়?
রেখে দে,—রেখে দে, দেখেছি অমন ঢের ঢের মিস রায়!...
বলে—জাঁদরেল মিস পাকড়াশি নেকড়ে-বাঘের বাড়া,—
তাকেই কখনো মানিনেকো!—
...চুপ!—দিসনে ওটাকে সাড়া!
চালিয়াৎ ডলি ডাকছে তোকেই! যাসনে ওটার ঘরে...
দেখতে পারিনে মোটেই ওটাকে,—কথা শুনে রাগ ধরে।
কথায় কথায় কোটেশন যেন বিদ্যের বুক-শেল্ফ!—
কোচিংয়ের বেলা কিন্তু কখনো কাউকে করে না হেল্প!
স্টাইল নিয়েই আছে দিনরাত, রূপের দেমাকে সারা,
দুঃখ কেবল নেই কটা চুল আর নীল-আঁখিতারা!
আমি বলি ভাই চামেলি বরং ঢের ভালো ওর চেয়ে!
হোক্ খাঁদা-বোঁচা, ছোট ছোট চোখ,—তবুও লাভলি মেয়ে!
বোস্ না একটু, কী যে তাড়া তোর!—খালি পড়া আর পড়া!
অত পড়ে পড়ে ড্রাই হয়ে যাবি, পড়ে যাবে প্রাণে চড়া
আয় বলি শোন্ মজার গল্প,—দোরটা ভেজিয়ে দে না!—
ভয় নেই,—আজ তাড়কারা কেউ তাড়া করে আসবে না!

জানিস তো এটা শনিবার,—যাবে মিস দাশ সিনেমায়,
ডাক্তার দে-কে নিয়ে বসে আছে অফিসেতে মিস রায়!
দেখেছিস ভাই ডাক্তার দে-কে? 'ওথেলো'র মতো কালো,—
আমার ডাকেন, 'কলেজ কুইন'! —লোকটি কিন্তু ভালো।
যেদিনই আসেন, মিস রায় দেখি সাজেন-গোজেন বেশ!
কী যে কথা কন্ মুখোমুখি বসে, হতেই চায় না শেষ।
ওকি! উঠলি যে!...বসবিনি আর? পড়ার হচ্ছে ক্ষতি?
বুক-ওয়ার্মের ব্যাসিলিতে তোর বিগড়েছে মতি-গতি!
যা,—যা, যা, চলে যা। সব বাড়াবাড়ি! আমরা পড়ি না যেন?—
জীবনে কখনো হলিনি তো ফার্স্ট,—তবু এতো চাড় কেন?

চলে গেলো! যাক্! হয়তো এবার নেবেই স্কলারশিপ্—
মেয়েটার দেখি জেদ আছে খুব,—মোছে না সিঁদুরটিপ্!
কত ঠাট্টাই করে কত মেয়ে,—চুপ করে সব শোনে,
হাতেও শাঁখাটি লোহাটি রেখেচে, দিবানিশি দিন গোনে—
ইংল্যান্ড থেকে এন. কে. বাসুর ফিরতে ক-মাস আর?
প্রাণপণে পড়ে,—এসে দেখে যাতে খুশি হয় স্বামী তার।
প্রতি রবিবার সকাল না হতে বিলিতি মেলের ডাক
কখন পাবে সে,—পথ চেয়ে থাকে—উদ্বেগে নির্বাক!
এমনি সরল, যদি কেউ বলে এবার আসেনি মেল—
জল ভরে ওঠে অমনি দু-চোখে, মুখটি শুকিয়ে পেল্!
মীরা মেয়েটিও মন্দ নয়কো, একটু রোম্যান্টিক,—
তা হোক্, ও রোগ বিয়ে হয়ে গেলে সেরে যাবে সব ঠিক।
মুস্কিল ওই রেণুটাকে নিয়ে, পাশের মেসের ঘরে
কে এক ছোকরা এস্রাজ নিয়ে রোজ রাতে গান করে।
তারি সুর এসে ঢেউ দিয়ে গেছে রেণুর হৃদয়-বীণে,
ঘুম নেই আর রাত্রিতে তার, কাজে মন নেই দিনে।
ঢিলে সুতো বেঁধে ফেলেছে যে চিঠি ছেলেটি এ ঘরে কাল,
পড়ে বোঝা গেলো রেণুর কপালে হয়তো পেকেছে তাল।
লিখেচে,—তোমাকে ভালোবাসি রেণু, তোমাকেই চাই আমি,—
তুমিই আমার যুগে যুগে প্রিয়া,—আমিই তোমার স্বামী।
হেনার চিঠিও এসেছে সেদিন সন্ধে হবার পর
আমার পুবের জানালাটি গলে—আমি যেন ডাকঘর!
লিখেছে...তোমায় না পেলে আমার জীবনটা মরুভূমি,
আমার হৃদয়-আকাশে গো হেনা ধ্রুবতারা আজ তুমি!
সুতো-বাঁধা-ঢিলে এদেরও জবাব করে প্রায়ই আনাগোনা,
ছাদে জানালায় চলে মাঝে মাঝে দূর হতে দেখা-শোনা।

মন্দ কী? এরা রয়েছে মজায়, হেসে খেলে গান গেয়ে ;
কেটে যায় দিন নিত্য-নবীন প্রেমের পত্র পেয়ে!
আমায় কিন্তু লেখে নাকো কেউ ভুলেও কখনো কিছু,
আমি ঘুরে মরি একলাটি শুধু এদেরই চিঠির পিছু।
এরা হেসে বলে হাতি-দি আমায়! এতোই কি মোটা আমি?
গায়ের রঙটা সাদা নয় বলে নইকি মোটেই দামি?
কখনো আমাকে 'ভালোবাসি'...কই বললে না আজো কেউ
ব্যর্থ হল এ জীবনের গাঙে নবযৌবন-ঢেউ।
ডলির গুমোর সয় না তো আর, চিঠি পড়ে উঠি ঘেমে,
আমিও কি শেষে পড়ে যাবো ওই সমীর সেনের প্রেমে?
কিন্তু, যাহোক—কপাল ভালো বলতেই হবে ওর,
এমন লাভার্ মেলে না সহজে, না হলে বরাত-জোর।
ভেরি হ্যান্ডসাম্ হেল্‌দি চেহারা,—ফাইন্ ফিজিক্—টল্
থরো অ্যাথেলিট্! জুড়ি নেই তার। কোথা লাগে নির্মল!
বাপ বড়োলোক, প্রকান্ড বাড়ি—মোটর দু-তিন খানা।
বি. এস্-সি. দিয়ে বিলেত যাবেই বিয়ে করে, এ-তো জানা!
নাঃহ্ ডলিটাব ভাগ্যিটা খুব,—কি-ন্তু, যায় না বলা!
রঙটা একটু কটা বলে তাই! নইলে খেতেন কলা!
ওই তো গড়ন? মোটে ভালো নয়, ফর্‌ম্ নেহাত ঢিলে,
শুধু ওর দুটো চোখের টানেতে সমীরকে জিতে নিলে।
তা ছাড়া কোঁকড়া কালো চুলে ঢাকা মুখের চটক তার,
প্রথম থেকেই ঘুরিয়ে দিয়েছে মাথাটাকে ছোকরার।
গান-টানও জানে, পিয়ানো বাজায়, কিন্তু বেজায় বোকা।
তা বলে কিছুতে সুন্দরী তাকে বলি না,—

—কে দিলি টোকা?

ওমা মীরা নাকি? আয়—আয়, ঈশ! চম্‌কে যা গেছি ভাই,
আমি তো ভেবেচি নিউ মেট্রন চপলাদি এল, তাই
ভেব্‌ড়ে গিয়েছি! বোস্ বোস্! কী রে? মুখ কেন অত ভার
হঠাৎ এমন জড়োসড়ো-ভাব দেখছি যে! কী ব্যাপার?
কথা কোথা গেল কথক্‌গিন্নি!...বোবা হলি নাকি মীরা?
আ গেল যা মেয়ে! মুখ দ্যাখো যেন আদ্যের গম্ভীরা!
...আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছিস? কেন? একি? চোখে জল
কী হয়েচে তোর? লক্ষ্মী-দিদিটি! সব কথা খুলে বল!
কোথা যাবি ভাই? ফিরবিনি আর? সত্যি, অ্যাঁ! বিয়ে হবে?
ঠিক হয়ে গেছে! হঠাৎ! বেশ তো! লগ্নটা শুনি কবে?
লগ্ন পরশু? ভালো, ভালো, ভালো! তোরও তবে হল গতি,
—কান্না কেন লো? ভুলে যাবি সব মনোমতো পেয়ে পতি।

কবি মুকুলের কোনো কথা আর থাকবে না মনে তোর,
ফুল-শয়নেই নয়নে মিলাবে কুমারী স্বপন-ঘোর।
ছন্দে যে ছায়া পড়েছিল চিতে, যে-ছবি কবির গানে
জেগে উঠেছিল কিশোরী মেয়ের কচি কিশলয়-প্রাণে,
সব মুছে যাবে ঘুচে যাবে মীরা যেই ভাই পাবি বর,
হয়তো সে-দিন আমরাও তোর হয়ে যাব কোন্ পর!
মন-ক্যামেরার ফিল্মে অমন কত মুখ পড়ে আঁকা,
আলো লেগে সব সাদা হয়ে যায়, কোনোটাই নয় পাকা!
কল্পনা তোর কুণ্ঠিত আজ বাস্তবে দিতে মালা?
ওরে, নয় এই মানব-জীবন শুধুই কাব্য-ঢালা!
ছন্দে ও গীতে কলেজ-রোম্যান্স মন্দ চলে না বোন,
কিন্তু, ও নিয়ে চলা চিরকাল নয় সম্ভব, শোন্,
দেহের মনের ক্ষুধার অধিক পেটের ক্ষুধাই বড়।
অনাহারে যদি আধমরা হয়ে, অমরু-শতক পড়,
কিম্বা চালাও ঋতু-সংহার—পেট কি লো তাতে ভরে?
সাধ্য কি তার রসভান্ডার তোমাকে তৃপ্ত করে!
চোখ মোছ দিদি! বুঝে দ্যাখ দিকি—জীবন স্বপন নয়,
দিন চলে গেলে অস্ত-আড়ালে যেমন সন্ধে হয়,
এই আমাদের ভাবের ভুবনে তেমনই দিন-শেষে
সাঁঝের আঁধারে নিয়ে সংসারে দেখা দেয় ঠিক এসে!
তবে কেন ভয়, কেন চোখে জল! চলে যা এগিয়ে ভাই!
প্রেমে পাগলিনী হয় কি সবাই? 'মীরা' নয় মীরাবাঈ!

দিনের শুরু

ছেড়ে দাও—ওগো, শোনো—লক্ষ্মীটি!
এখন আমায় রেখ না ধরে!
ঢের কাজ ফেলে পালিয়ে এসেছি—
সত্যি বলচি..সত্যি করে!
আচ্ছা, আজকে দুপুরেতে ঠিক
আসবই দেখ, এখন সরো!—
ওই জন্যে তো ঢুকিনি এ ঘরে,
এলেই অমনি জড়িয়ে ধরো!
ভা-রি অসভ্য হয়েচ কিন্তু!
লজ্জা নেইকো একটু মোটে।

উঁহু!—হাত ছাড়,—খালি টানাটানি!
বড্ড আমার লেগেছে ঠোঁটে।
যাও, সরে যাও! ভালো লাগেনাকো,
কেন রাতদিন পিছনে লাগো?
ছি ছি! তুমি একি করলে বলো তো?—
তোমার সঙ্গে পারিনে, মাগো!
মাথার কাপড় টেনে, খুলে খোঁপা,
টিপ মুছে দিয়ে—আমাকে যেন
কী পেয়েছ তুমি! যাও সরে যাও,
—এত জ্বালাতন বলো তো কেন?
মরিও যদি বা—তবু কক্ষনো
আসব না আর তোমার ঘরে!—
যখন-তখন বউ নিয়ে বুঝি
খুনসুড়ি কেউ এমন করে?
আচ্ছা, এইতো? আজকেই আমি
দিব্যি গালচি,—'রাত্রে ঘরে—'
আঃহু! লাগে—লাগে! ছাড়ো, এত জোরে
মুখ চেপে বুঝি মানুষে ধরে?
দোর দিয়োনাকো! ছি ছি! এ সকালে
একি শুরু হল দস্যিপনা!
বলবে সবাই—নতুন বৌয়ের
লজ্জা-সরম নেইকো কণা!

*

কিছুতে দেব না! কক্ষনো নয়!
যখন-তখন জুলুম নাকি?
ভেবেচো কি এটা মগের মুলুক?—
চলবে না আর ও-সব ফাঁকি!
সকাল সন্ধে জ্ঞান নেই কিছু,
সামনে পেলেই চুমুর দাবি!
বিয়ের আগে যে কাটাতে কী করে,
আমি আজ শুধু সেইটে ভাবি.
আধখানি কিস্‌ও পাবেনাকো! ঈশ্‌!
জানো তো এখানে আমিই রানী!
স্পর্ধা তোমার বেড়ে গেছে বড় ;
ও রোগের আমি ওষুধ জানি!

সাধলে কাঁদলে ভবী ভুলবে না!
অনেক শাস্তি রয়েচে জমা ;
আমার রাজ্যে আইন কঠিন,
বিদ্রোহী কেউ পায় না ক্ষমা!
সরো, আমি যাই! রাগিয়ো না আর!
পড়ে আছে ঢের কাজের তাড়া!
কী যে খুনসুড়ি কর বসে খালি!
ছেলেমানুষেরও হয়েছ বাড়া।
দাও ছেড়ে দাও! দোর খোল, যাই!
আটকে-রেখ না কাজের বেলা,
বসব না আমি তোমার চেয়ারে...
তবু কী যে কর! কেবলি খেলা!

* * *

ও কি ও! দোহাই! পায়ে পড়ি ওগো।
রঙ্গ এখন বন্ধ রাখ।
সকালে এ সেন্ট মাখালে—আর যে
বাইরে বেরুতে পারবনাকো!
শাশুড়ি-ননদ আশে-পাশে সব!
সকাল বেলাই এসেন্স্ মেখে,
কী করে ওঁদের কাছে যাব ছি ছি!
গন্ধ কী করে রাখব ঢেকে?
তোমার ফরাসি সেন্টের স্প্রেতে
কী যে পরিমল ছড়ায় রাতে!
সুরভিমত্ত করে তোলে মন,
ভুবন আমার স্বপ্নে মাতে।
চায় না কিছুতে ছেড়ে যেতে যেন!
স্নানের শেষেও জড়ায় ধীরে!
তোমার মতোই একগুঁয়ে ভারি!
সারাদিন ফেরে আমারে ঘিরে!
রোসো না.—তোমার সব শিশি আমি
শেষ করে দেব খানিক পরে!
যখন-তখন গায়ে ঢেলে দাও!
সবাই আমাকে ঠাট্টা করে!
কাজের সময় যত দুষ্টুমি,—
ঝক্‌মারি আসা তোমার কাছে!

গুরুজন কেউ দেখে ফেলে পাছে!
ভয়ে-ভয়ে আসি, কে কোথা আছে!
দিলে খোঁপা খুলে—মিছিমিছি—ছি ছি!
আঁচল মাখালে 'লাভ্‌-মী' ছাই!
তোমার জ্বালায় আলুথালু-বেশ!—
কী করে এখন বাইরে যাই!—
তোমার কী বল?—দেখবে সকলে,
ঠায় একমনে পড়চে ছেলে!
'যত নষ্টের গোড়া বউটাই।'
বলবে এ-ঘরে যে-কেউ এলে!
চায়ের পেয়ালা দিতে এসে এত
বিপদ ঘটাবে আমি কি জানি!
সকাল বেলাই দোরে দিলে খিল,
লজ্জা কি নেই একটুখানি!

নিশীথ-কলহ

(উদাস কণ্ঠে)

রাগ করে দ্বার বন্ধ করেছি?..তা কেন হবে?
—ঘুমাতে ছিলাম দাদুরী রবে!
ঠেলিয়াছো তুমি বারে-বারে দ্বার,—ডেকেছো—'বীণা'?
হয়তো তা হবে! ঘুমে অচেতন আছিনু কি না!
আজি কেন এত গাঢ় ঘুমায়েছি?...শ্রাবণ মাসে
আধ নিশা জেগে কাটালে কাহার ঘুম না আসে।

(পঞ্চম কণ্ঠে)

রাত বেশি নয়? সবে এগাবোটা? হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি!
পুরুষের এ তো সন্ধ্যা মানি।
সাঁঝ-রাতি হতে পত্নীর কাছে এলে কি চলে?
মধুপের জাতি! তোমরাই সুখী অবনীতলে।
ঘন-উদ্বেগে পথ পানে চাহি কাহারো আশে
দীপ জ্বালি কভু হয় না কাটাতে, জানালা পাশে।

(সপ্তম কণ্ঠে)

সারা দিবসের কাজের বালাই? দোহাই থামো।
অত মিছে কথা কোয়ো না, রামো।
সন্ধ্যা হইতে এতখানি রাত—কী কাজ শুনি।
রাগায়ো না মোরে মিছামিছি ফাঁকা বাক্য বুনি।
সরো,—সরো,—চাটু তোযামোদে আর ভুলিবনাকো।
ছাড়ো হাত। ঘুম পেয়েছে বেজায়। ছেলেমি রাখ।

(বিস্ময়ব্যাকুল কণ্ঠে)

ও কী? কোথা যাও?...মেঘ ডাকে,—জল নামিবে ফের্।
রাগ হল বুঝি?—হয়েছে ঢের।
এসো ঘরে। আহা। কেন ফেলে দিলে হাতের ফুল?
এত অভিমান? আর বকিব না। বুঝ না ভুল।
অতদূর হতে রুমালে বাঁধিয়া করিয়া পুঁজি.
ফেলিবারি তরে ফুল-হার কিনে এনেছ বুঝি?

(সলজ্জ কণ্ঠে)

আজি তো খোঁপায় জড়াই নি মালা, গুঁজি নি ফুল।
জানি তুমি দেবে, হবে না ভুল।
সারাদিন-ভোর ঘড়ির কাঁটায় নজর রাখি
কী ব্যাকুল আশে চেয়ে থাকি পথ, জান না তা কি?
ঈশ্।...তোমারও এমনিই কাটে দিবসখানি?...
মোটে মানিনেকো।...পুরুষের প্রাণ, খুব সে জানি।

(মুগ্ধ কণ্ঠে)

অভিমানে দ্বার রুখেছিনু।—দুর! ঘুমাব কেন?
দুষ্টু!...কিছুই বোঝ না যেন!
ওগো কর মাপ্। অবুঝের মতো বলেছি যা তা,—
অভিমানে জ্ঞান হারাইয়ে ঠিক ছিল না মাথা।
জানি-জানি, জানি, বলিতে হবে না, পরানতম।
তোমারি প্রেমেতে মুখরা যে জন, তাহারে ক্ষম।

সন্ধির সূত্র

কাল আমাদের ঝগ্‌ড়া হয়েচে। সে ভারি মজার শোন্—
কিছুতে কথায় না পেরে শেষটা চটে গেল একজন!
        মানলে না তবু হার!
            দোষ বল্ তবে কার?
হার যদি ভাই মানত তা হলে মিটিয়ে নিতুম ঠিক!
আমার সঙ্গে সমানে তর্ক? ফল তার বুঝে নিক!

আমার ভুল বা আমার যা ত্রুটি আমি কি বুঝিনি, বল্?
ওর বুদ্ধির দৌড়টা শোন্! খালি মিছে ধরে ছল!
        কেবলি বোঝাতে চায়,
            মেয়েরাই নিরুপায়!
রাগ ধরে কিনা তুই-ই বল দেখি! তাইত বলেচি চটে,
'অনধিকার যে চর্চা' তা যেন করেনাকো কেউ মোটে!

কথা তো বন্ধ করেছিই, আরো কঠিন শাস্তি চাই!
ভাবচি, না হয় হপ্তাখানেক গোপালনগরে যাই!
        সহজে করলে মাপ
            পুরুষের বাড়ে দাপ.
পত্নী-প্রতাপ মানে না যে পতি, অপরাধী সে তো ঘোর!
নির্বিচারেই হেরে-যাওয়া রোজ ডিউটি নয় কি ওর?...

জানিস পারুল! সকাল থেকেই হাজারো মিথ্যে ছলে.
ফন্দি খাটিয়ে ঘুরছে আমায় কথাটি কওয়াবে বলে!
        'জরুরি অমুক বই
            পাচ্ছি না কেন?...কই?
ওরে বেটা হরে! খোঁজ্ কোথা গেল ফাইলটা দরকারি!
—রিডিং-রুমের বড় টেবিলটা নোংরা হয়েচে ভারি!'

কলেজ যাবার সময়ে সে আজ সাজা যা পেয়েছে শোন্!
দুর্দশা দেখে হাসি কি কাঁদি তা ভেবেই পাইনি বোন!
        —সেই ঝগড়ার পরে
            ঢুকিনি তো আর ঘরে!
ও মহলে গিয়ে জায়েদের কাছে আস্তানা নিয়ে আছি!
ভয় দেখিয়েচি,—চলে যাব আমি বড়দির কাছে—রাঁচি!

কী বলছিলুম? ভুলে গেছি ; হ্যাঁ হ্যাঁ, কলেজে যাওয়ার কথা ;
নবীন অধ্যাপক মশায়ের শোন্‌ কত যোগ্যতা!
স্নান করে উঠে আজ—
চুল আঁচড়ানো, সাজ
মোটেই হল না। সেটা আমি রোজ করে দিই কিনা! তাই,
মাথায় কেবল এলোমেলো করে বুরুশ্‌ বুলুলে ভাই!

ফরসা পিরানে ময়লা কলার কোটটা হল না ব্রাশ,
নেক্‌টাইটাও বাঁধতে জানে না, উল্টো টেনেছে ফাঁস!
টাইক্লিপ গেল খুলে ;
রুমাল নিলে না ভুলে!—
চাকরের সাজা পান খেয়ে জিভে যা সাজা পেয়েছে চুনে!
কী করে আজ যে দেবে লেকচার? লোভ হয় আসি শুনে!

হাসছিস কি লো? লুটিয়ে প'লি যে!...অত ভালো নয়, থাম্‌!
তোরও দিন এলে বুঝবি তখন, এ দিনের কত দাম!—
চায়ের কাপেতে ঝড়...
তোদেরও উঠবে। সর্‌,
জ্বালাসনে আর! বেলা পড়ে এল, চুলবাঁধা শেষ কর্‌!
আ—মর্‌! আজকে হাসি-ভূত তোর ঘাড়ে কি করেছে ভর?..

মিহি সরু-ডুরে শাড়িটা, পারুল। বাথরুমে দিয়ে যা না।
বাদামি-ব্লাউজ?...আচ্ছা দে ওটা। আনিস সাবানখানা।
ঠাট্টা কিসের অত?
নই তো তোদের মতো।
যুদ্ধজয়ের পদ্ধতি কিরে বোঝে যারা নাবালক?
আইবুড়ো নাম ঘুচুক—তখন, তোদেরো ফুটবে চোখ।

স্পষ্ট বলতে কষ্ট কী বল্‌? লজ্জারো কিছু নয়।
সন্ধ্যা না হতে সন্ধি করতে আসবে সে নিশ্চয়।
জিততে হবেই আজ।
নইলে এ নামে লাজ!—
বিদ্রোহী-সাথে অপরাজিতার সন্ধি সহজ নাকি?
এ সব নিগূঢ় রণনীতি তোর শিখতে এখনো বাকি।

বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি

রানুদি! তোমার পত্র পেয়েছি প্রায় আজ দিন ষোল,
নানা ঝঞ্ঝাটে দিইনি জবাব—তাই ভাই দেরি হল।
রেগো না তা বলে—দোহাই দিদিটি! দুখিনী বোনেরে ক্ষম
বরষায় তার দিনগুলি ভাই, কাটে না তোমার সম।

তুমিতো লিখেছ—আষাঢ় এসেছে আকাশ ভুবন ছেয়ে,
পুলকে তোমার নাচে মন সদা বাদলের সাড়া পেয়ে!
কবির ভাষায় লিখেছ—'এসেছে গগনে ছড়ায়ে চুল
রূপসী বরষা, চরণে জড়ায়ে বিকশিত বনফুল!'

গিরিধির গিরি নদী মাঠ ক্ষেত মহুয়া শালের বনে
অপরূপ তার ফুটেছে কান্তি, প্রাবৃটের পরশনে।
নিদাঘ-দগ্ধ প্রান্তর ছেয়ে নবীন দূর্বাদল
শত সবুজের তুলি টেনে-টেনে ছবি আঁকে অবিকল!

উষরা উশ্রী নব যৌবনে সুশ্রী হয়েছে আজ!
মেঘে ও রৌদ্রে আলোছায়া নিয়ে কাড়াকাড়ি খেলা কাজ!
বাড়ির লাগোয়া ফুলের বাগানে চামেলি চাঁপার মেলা,
গন্ধে পাগল ভিজে পুবে হাওয়া ছুটে আসে দুটি বেলা!

মাঠে-মাঠে সেথা হরেক রঙের ক্ষুদে-ক্ষুদে ঘাস ফুল
ফুটে উঠে যেন বুনেছে গালিচা—দূর হতে হয় ভুল!
কাব্য রচিয়া, পড়ি মেঘদূত, গান গেয়ে-গেয়ে সাঁঝে
তুলি ঝংকার সেতারে তোমার দিন তবু কাটে না যে!

সুখে আছ তুমি ; শুনে সুখী হল আমার দুখের প্রাণ!
হোক অক্ষয় তোমার ভাগ্যে বিধাতার এই দান।
এমন আষাঢ় কেমন আমার লাগিছে জানিতে চাও?
শোন বলি ; তার বাদ দেবনাকো খুঁটিনাটি কোনোটাও।

তোমার নয়নে নবীন বরষা দেখা দেছে যেই সাজে,
আমি ঠিক তার বিপরীত ভোগ ভুগি কলিকাতা মাঝে।
অতিরঞ্জিত পাবে না কিছুই, কবি নই আমি নিজে ;
কেরানির বউ কাজ করি রোজ ভোর থেকে ভিজে-ভিজে!

বর্ষার বড় ভালো নেই কেউ, বিশেষ 'অমুক' বাবু—
দাঁতের গোড়ার যাতনায় দিদি, হয়ে আছে ভারি কাবু।

জলে-জলে ভিজে ছেলেমেয়েগুলো নানা রোগে নাজেহাল,
সর্দিকাশি তো আছেই, তা ছাড়া হজমেরো গোলমাল!
কারো টনসিল, গালগলা ফুলে, কারু বা ডেঙ্গু-জ্বর,
এই তো সে-দিন ইনুফ্লুয়েঞ্জা হয়ে গেল পর-পর!

সারাদিন জল ঝরে অবিরল বাহিরে যাওয়ার বাধা,
আপিসের পর বাড়ি ফেরে রোজ বাজ্যের মেখে কাদা!
কখনো-কখনো ঢেউ কেটে হেঁটে হাঁটু জলে যেতে হয়!
বর্ষার শুনি ভিজে ফুটপাথ নিরাপদ মোটে নয়।

মোটর বাস ও ট্যাক্সিরা যত নিরীহ পথিক-গায়
তরল পাঁকের পিচকারি ছুঁড়ে হোলিলীলা খেলে যায়।
তিরিশ দিনেও ধোপা আসেনাকো ময়লা কাপড় জামা ;
শ্যাওলা-পিছল কলতলা দিদি, ঘষে-ঘষে মরি-ঝামা!
স্নানের সময় পাছে পড়ে যান এই ভয়ে সারা হই—
কেউ যে আমার আপনার নেই সংসারে উনি বই!
ভিজে জুতো পরে মানা করি যেতে আপিসেতে কতবার,
হেসে বলে যান, 'শুকনো জুতো কি ভাঁড়ারেতে আছে আর?'

এত গেল ভাই কর্তার কথা, গিন্নির হাল শোন ;
বাজার আক্রা, তরিতরকারি ভালো মেলেনাকো কোন।
ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরান বলে বোঝাবার নয়!
তাও আজ-কাল কত দাম জানো? পয়সায় খান-ছয়!
রান্না চাপাতে দেরি হয়ে যায়, আপিসের ভাত লেট
আধ-খাওয়া করে নিত্য ছোটেন, নইলে চলে না পেট।

দেশলাই-কাঠি ঘষে-ঘষে সারা, জ্বলতে চায় না মোটে!
তামাকের টিকে ধরে না কিছুতে ফুঁ দিয়ে নাকাল ঠোঁটে!
ফাটাছাদ দিয়ে জল ঝরে-ঝরে বিছানা বাক্স ভেজে ;
রোদের অভাবে স্যাঁৎসেঁতে সদা শোবার ঘরের মেঝে!
নড়ে বসি হেন ঠাঁইটুকু নেই, একতলা ছোটবাড়ি,
ঘরের ভিতরই দেয়ালের গায়ে মেলে দিই ধুতি শাড়ি।
খদ্দর দিদি আর্দ্র হলে যে কেচে তোলা কী কঠিন,
বর্ষার শুধু শুখোতেই লাগে সমানে তিনটি দিন।

ঘরের তাকেতে উই ধরে করে কত কী যে লোকসান,
বইতে খাতাতে ছাতা ধরে রোজ, মুছে মুছে হয়রান!
ছাদের ছোট্ট কাঠের সিঁড়িটা এমন হয়েছে ভিজে—
আচার-বড়িটা রোদে দিতে গিয়ে পড়ে মরি কবে নিজে।

কলে জল আসে ঘোলাটে এমন, ফটকিরি দিতে হয়,
মশার বিনাশে কামান দাগা সে কথাটা মিথ্যে নয়!
এত উৎপাত বেড়েছে ওদের মশারিও মানে হার।
পাখা নেড়ে-নেড়ে সারারাত চোখে ঘুম আসেনাকো আর।

স্নান করে উঠে শুকোয় না চুল, গলার ব্যথায় মরি,
নুনের কেঠোটা রসে হয়ে গেছে লবণ-হ্রদের তরী!
কোলের ছোট্ট ছেলেটার কাঁথা শুকোয় না দিতে রাতে,
রুটি সেঁকা করে সেঁকি তাকে ভাই, উনুনে আগুন-তাতে।
আষাঢ় আসার সাথে-সাথে ভাই, বাসাড়ে শহুরে যত,
চাষাড়ে হয়েই ওঠে যেন সব—নয় তোমাদের মতো!
বিকচ কদম, ঘন কেয়াবন কোনদিকে জানিনি তা—
আজ আসি তবে, চিঠি দিয়ো। ইতি তোমারি 'অপরাজিতা'।

শেষ রাত্রি

কাল তুমি রবে এমন সময় অ-নে-ক যোজন দূরে
যত ভাবি ততো উথলি হৃদয় অবাধ্য আঁখি ঝুরে।
ওগো কাছে এসো, আবও আরও কাছে, নাও মোরে আরও টানি,
তোমার বাহুর অভয়-বাঁধনে বাঁধো মোর তনুখানি।
কোন ব্যবধান রেখনাকো আর, ওগো আজ শেষরাতি,
দূর করে দাও উপাধানগুলো—নিভাও বিজলি-বাতি।
বাকিরাতটুকু বক্ষে তোমার বেদনার নীড় বেঁধে
চক্ষের জলে ভাসিয়া কেবল নীরবে কাটাব কেঁদে।
তুমি ঘিরে আছ তবু যেন প্রাণ গুমরে ব্যথার সুরে,
যত ভাবি কাল রবে এ সময়—অ-নে-ক যোজন দূরে!

ওগো কাল রাতে এমন সময় ভেঙেচুরে দুটি প্রাণ,
কত নদী-গিবি মরু-প্রান্তব বিরচিবে ব্যবধান!
তোমার অভাব-বেদনা আমার হয়তো অসহ হবে,
জীবনে প্রথম ছাড়াছাড়ি এ যে—বহুদূরে তুমি রবে।
হাতটি বাড়ালে পাব না পরশ, আসিবে না কানে স্বর,
দেখিতে পাব না সারাদিন রাতি, শূন্য রবে এ ঘর।
ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগো! আসিলে রাত্রি, কাল
আমার প্রহর কাটিবে কেমনে! ছিঁড়িবে স্বপ্নজাল!

শুধু বিচ্ছেদবেদনা সৃজিবে সকাতর অভিমান,
ওগো কাল রাতে এমন সময়ে ভেঙেচুরে দুটি প্রাণ!

কত দিন ওগো ঘুমোতে পাব না এমনি জড়িয়ে গলা,
সারারাত জেগে কানে-কানে এই, যা মনে আসে তা বলা!
কপোলে-কপোল মিলায়ে বিভল-আবেশে বাক্যহীন,
তবে তো মোদের মধুরাতি কাটে, সজল শ্রাবণ-দিন!
ওগো! ওগো মণি! শুনচো, সোনাটি! আমার প্রাণের আলো!
—কিছু না। এমনি ডাকচি!—তোমায় ডাকতে লাগে যে ভালো!
কাল তো এমনি পাব না তোমায়. এসো আরও, আরও..কাছে—
রাত্রি পোহাতে, চেয়ে দেখ, আর একটি প্রহর আছে।
কত কথা ছিল সবি রয়ে গেল, হল না কিছুই বলা,
ওগো কত দিন পাব না ঘুমোতে এমনি জড়িয়ে গলা!

হ্যাঁগো, মনে ঠিক রবে তো? আমায় ভুলে তো যাবেনা শেষে?
মনুকে তোমার হারিয়ে না যেন বিদেশিনীদের দেশে!
শত রূপসীর আঁখির অতলে কালো 'মনুয়া'র স্মৃতি
দেখ যেন ডুবে যায় না! জগতে ঘটেও এমন নীতি!
না না, বলব না, বাগ কোরনা গো, লক্ষ্মী আমার মণি!
সয় না বুঝি এ ঠাট্টাটুকুও?...ব্যথা পাও তক্ষনি!
...চিঠি পাব কবে? মঙ্গলবারে? আজ সবে শনিবার!
রবি সোম দুটো কাটাব কী করে? পৌঁছেই করো তার!
না-না, কালই চিঠি লিখো ট্রেন থেকে, ডাকঘরে নেব এসে—
হ্যাঁগো!...মনে ঠিক থাকবে তো? গিয়ে—ভুলে যাবে না তো শেষে?

ওই তো ফরসা হয়ে আসে, ওগো, সরে এসো...চুমু দাও
লজ্জা আমার ঘুচে গেছে আজ, ফিরে দেব যত চাও!
কী জানি কেন গো মনে হয় যেন, আজ রাতই শেষরাত,
কী যে ব্যথা বুকে বেজে ওঠে...উঁহু! দাও দাও...দেখি হাত—

আঃ কী আরাম! জুড়িয়ে গেল গো...তোমার পরশ পেয়ে!
কাঁদব না আর, মুখ তোল তুমি, ভালো করে দেখ চেয়ে
তোমারো চোখেও জল যদি ঝরে—ওগো তুমি বলো তবে
তোমার পাগল 'মনুয়া'র মন কেমনেতে থির্ রবে?
আরো একবার দুটি বাহু ঘিরে নিবিড় বাঁধনে নাও!
ওই তো ফরসা হয়ে গেল ওগো...শেষ চুমু ক-টি দাও।

ওগো এ সময় মরণ আসে তো তাব বাড়া সুখ নেই,
তোমার বুকেতে লীন হয়ে থাকা. আমার স্বর্গ এই!

তোমারে পাওয়ার চেয়ে সেরা কিছু কাম্য নেই এ প্রাণে,
আমার মোক্ষ মিলেছে বন্ধু! তোমারে আত্মদানে!
কলঙ্ক আজ-চন্দন মোর. নিন্দা হয়েছে ফুল,
মনুর সমাজে কুলোয়নি ঠাঁই, ভেঙেছে স্বজন-কুল!
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোমারেই ছাড়া দায়।
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন-কায়!
ওকি! না না, এসো, আরেকটু শোও—ভোর হল সবে এই!
আমার মরণ এ সময়ে এলে তার বাড়া সুখ নেই।

আঁধারে আলো

(বৈকালে জানালায় একা)

পথ চেয়ে বসে আছি সেই থেকে এই—
ছটা বাজে গ্যাস জ্বালে ; তবু দেখা নেই!
সবাই তো এপাড়ায় ফিরে এল ঘরে,
আজ কেন আসতে সে এত দেরি করে?

কাল থেকে বলে-বলে মানলুম হার!
কিছুতে কি ফুরসুৎ মিলল না তার?
দেড় গজ কারপেট—দু-প্যাকেট উল্
এই তার আনতে কি রোজই হয় ভুল?

দুবেলা তো মনে করে দিই বার-বার,
তবু ভোলে?—এর মানে বুঝিনি কি আব:
আগে তাকে কোন কথা একবার বই
বলবার দরকার হত না তো কই!

আজকাল যেন আর দেয় না সে কান!
মিছে কথা কয় খালি—ভুলে-যাওয়া ভান!
গ্রাহ্য করে না দেখি ক-দিন ধরেই ;
আনছে না কিনে এটা ইচ্ছে করেই।

না আনুক!—আমি তাকে বলছিনি আর!
মনে করে—করব বা খোসামোদ তার!
সে মেয়ে যে নই সেটা বোঝাবই তাকে,
ফাঁকি দেয়া নয় বড়ো সহজ আমাকে!

এ যে তার অবহেলা, বুঝি আমি বেশ!
আজ থেকে আর নয় ; হয়ে গেল শেষ।
ভালোমানুষিতে ওর ভুলছিনি আমি!
সত্যি যা বলবোই, হলেই বা স্বামি!

গো-বেচারি সেজে থাকে যেন ভালো কত?
ধড়িবাজ লোক কেউ নেই ওর মতো!—
থাকব না কাছে তার সয়ে অপমান ;
চলে যাব যে-দিকেতে যেতে চায় প্রাণ!

কিসের খাতির এত? কথা রাখেনা যে,
তার বাড়ি কেন মিছে খেটে মরি বাজে?
আমি যেন কেউ নই! উনিই মালিক?
রোসো, আজ বোঝাপড়া করে নেব ঠিক।

যত কিছু বলিনেকো ততো যায় বেড়ে!
আসুক বাড়িতে আজ, বলব না ছেড়ে!
আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়েই দিক!
ঘর-সংসার ওর নিজে বুঝে নিক!

এখনো যে ফিরল না ব্যাপার কী তার?
এত দেরি কখনো তো করেনি সে আর!
তাইতো!...কি হল?...এত ভালো কথা নয় ;
না—না—ওই আসছে সে!—ঠিক!—নিশ্চয়!

সন্ধ্যায় ছাদে দুজন

এখানেও এসে তবু নেই নিস্তার!
দেবনাকো সাড়া, খুশি! কী করেছি কার?
ছাদে কেন একা আছি?...জবাব তো তার
তোমার শোনার কিছু নেই দরকার!

সেই থেকে খোঁজাখুজি সারা বাড়ি ভোর?
কেন? আমি পলাতক আসামি, না চোর?
নজরবন্দী হয়ে গারদখানায়
কয়েদি থাকতে হবে অ্যাতো কি বা দায়?

হিম পড়ে আজকাল.. পড়ুক দেদার!
ঠান্ডা লাগতে পারে?...লাগুক আমার!

আমি তো কারুর ঘর জুড়ে বসে নেই,
বাড়ি ছেড়ে যাইনিকো—অপরাধ এই!

ঘরে যেতে হবে!...কেন! হুকুম এ নাকি?
বেশ! সারারাত যদি ছাদেতেই থাকি,
কারুর তো বাধা দিতে নেই অধিকার!
দাসী-বাঁদি নই কারো,...ডেকনাকো আর!

নোংরা ছাদের কোণ? শ্যাওলায় কালো?
তা হোক! এখানে আমি বেশ আছি ভালো!
থাকব কি রাতভোর এইখানে?—তার
দিয়েছি তো উত্তর—'ইচ্ছে আমার'!

নামব না আপাতত।...খানিকটে পরে?
নীচেয় যেতেও পারি ঢুকবো না ঘরে।
আঃহ্! কেন হাত ধরো?—টেনোনাকো—ছাড়ো-
জ্বলে পুড়ে সারা আমি,—জ্বালিও না আরো!

ছাড়বে না হাত তুমি?—বলো না কী চাও?
কোন কথা শুনব না!—যাও, চলে যাও!
আমি তো কারুর কিছু ধারিনেকো ধার,
এসোনাকো কেউ মোটে সামনে আমার!—

শুনতে চাইনে আর শুভ সংবাদ!
মরণ হলেই বাঁচি! মেটে সব সাধ।
জগতে আপন যার নেই কোনোখানে,
বেঁচে থাকা কী যে পাপ—সে-ই শুধু জানে!

থাক থাক চুপ করো, তোমার প্রেমের
ও সব কেতাবি বুলি শোনা গেছে ঢের!
সবেতেই জিতে নাও বচনের চোটে!
মিছে কথা ঠোঁটে কিছু বাধে না তো মোটে!

কথায় ভেজে না চিঁড়ে! আজ চেয়ে মাপ্
কাল তো আবার ফের ভুলে যাবে সাফ!
তার চেয়ে ছেড়ে দাও, লেগনাকো পিছু,
বেশি কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই কিছু!

আজ গিয়ে শোবো আমি পিসিমার ঘরে,
কাল ভোরে চলে যাব গোপালনগরে।

উহুঃ—সরো, ছাড়ো—ছাড়ো, লাগছে আমার!
বেহায়ার মতো ছি-ছি, জড়িও না আর—

ছেড়ে দাও, রাত হল, নেমে যাই, সরো!
—অবাক! কী বলে চুমু চাও এর পরও!
লজ্জা কি নেই মোটে?—ঈশ্!...তাই নাকি?
কারপেট পশমের বখশিস বাকি?—

তাই আজ দেরি হল ফিরতে তোমার?
সত্যি? এনেছ? বল গা ছুঁয়ে আমার!
কী মিথ্যে কথা তুমি কইতে যে পার!
দেখি—দেখি দাও,—বাঃহ্! উহুঃ—ছাড়ো ছাড়ো—

সুড়সুড়ি লাগে বড়ো, ছাড় পড়ি পায়!
কাতুকুতু দিয়ো না গো!—দোহাই তোমায়!
বেজায় জুলুম বাপু! এই নাও,...হল?...
...যাও, ভারি দুষ্টু—হুঁ!...ঘরে যাই চল।

মধ্যস্থ

করতো খোকন জিগেস ওকে—লজ্জা কি নেই ওর?
কোনমুখে ও আবার এসে ডাকছে মাকে তোর!

দুপুরবেলা যা ঝগড়া ও করেছে—তারপরে—
সাঁঝ না হতেই কি বলে ফের ঢুকলো আমার ঘরে?

কইব না তো একটি কথাও বল না খোকন ওকে—
এই ঘরে তোর 'অমুক' এসে আর যেন না ঢোকে!

আজ থেকে আর কারও সাথে কোনও সুবাদ নেই ;
একলা আমি দিন কাটাবো—পণ করেছি এই।

আমরা খোকন মা-ছেলেতে থাকব মিলেজুলে
ওর সাথে সব সম্পর্ক দিলুম এবার তুলে!

বল না ওকে—আমার কাছে আর আসে না যেন
চাইনে আমি শুনতে ও সব মিথ্যে হেন-তেন!

সাতমাসে তুই পড়বি খোকন এই ফাগুনের শেষে,
সকল কথায় এমন করে উঠিসনি আর হেসে।

থাকতে এমন যোগ্য ছেলে—সইবে কি তোর মা
টিটকিরি আর ঠাট্টা পরের? বয়েই গেছে না!

তুই যে আজও বেজায় বোকা—দুঃখু আমার তাই,
নইলে ওকে কিসের কেয়ার? ওর পরি না খাই!

ওর সাথে আর কইতে কথা সাধ নেইকো মোটে,
চোখ রাঙানির ধার ধারি কার? যাকগে না ও চটে!

একলা ঘরে থাকব আমি—আপন মনের সুখে
কোল জোড়া ধন খোকনমণি থাকবি মায়ের বুকে!

ঘুম পাড়াব গান গেয়ে রোজ খেলব কত খেলা
লক্ষ চুমোয় রাঙিয়ে দেব—সন্ধে-সকাল বেলা!

চোপ দুষ্টু! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখিসনি আর ওকে—
ককিয়ে হাসি! দস্যি ছেলে! মারব এবার তোকে।

ওর দিকে না চাইতে বারণ করছি—তবু—ফের!
এমন ধমক এবার দেব: বুঝবি তখন টের!

তবে রে চোর! শয়তানি তোর! ঐ কোলেতেই যাবি?.
অমন কোরে হাত বাড়ালে—এমন পেটন খাবি!

রোস তো! ছেলের কান্না আমি দিচ্ছি করে বার!
বজ্জাতি তোর এখন থেকেই? অবাধ্যতা মার?

চুপ-চুপ-চুপ! আর কেঁদো না, লক্ষ্মী আমার! সোনা!
কে বকেছে জাদুমণি! ওরে ও চাঁদের কোণা?

এই নে কেমন ঝুমঝুমি তোর, রঙিন চুষি—ফুল,
আমার বুকের রতন মানিক—সংসারে নেই তুল।

বুঝলি খোকন—একটি কথাও শুনব না ওর আর,
বল্‌তো ওকে বাইরে যেতে—কাজ নেই কি তার?

আগলে দুয়োর এমন করে লাগলে কেন ফেউ!
নেই বুঝি আজ তাসের ইয়ার? ব্রীজের দলের কেউ?

বল্ না, 'তুমি হেথায় কেন? যাও না তোমার কাজে,
করছ মিছে ভেনর ভেনর! বকছ শুধুই বাজে?

ঢের শুনেছি ও সব কথা—নতুন কিছু নয়—
এখন তুমি এ ঘর থেকে নড়লে ভালো হয়।

বড্ড গরম! মাথার কাপড় খুলবে এবার মা,
কেমনতর ভদ্র তুমি?...বাইরে সরো না—

এই ঘরেতেই আমরা দুজন দিব্যি দেব ঘুম
চাইনে তোমার খাট-বিছানা—লাইট ফ্যানের ধুম!'

বল্ না খোকন—'মিথ্যে কেন তর্ক করো আর?
মীমাংসা তো চাইছে না মা—দরকারও নেই তার।

আমার নিয়ে পৃথক হবেন কঠিন এ তাঁর পণ,
সইছে না আর এমনধারা নিত্যি জ্বালাতন!'

ও-মা!...ও-মা! দস্যি ছেলে! আবার তুলে হাত
ওই কোলেতেই যাবার ফিকির? নেমকহারাম জাত!

ডুকরেপিটে কান্না! বটে!...থাম তো ছুঁচো পাজি—
এই বয়সেই বাপের মতো শিখছ কি কারসাজি?

সব রকমের দুষ্টুপনা—ফন্দিবাজি যতো—
একরত্তি ছেলের দেখি ঠিক কি বাপের মতো!

দোহাই খোকা! চুপ কর্ তুই! চেঁচাসনি আর—মা-গো!
তোমার দোষেই বিগড়েছে এ!...বড্ড পিছু লাগো!

আর পারিনে ডাকাত নিয়ে! থামাও বাপু! ধরো!
বেজায় ক্ষেপে উঠলো যে গো! যা হয় তুমি করো!

কেমন লোকের পুত্রটি—হুঁ! সবচে জেদির সেরা!
ভিতরটি ওর বজ্র কঠিন—বাইরে ফুলের ঘেরা।

দেখতে অমন বাপের মতো হয় তো অনেক ছেলে,
কিন্তু, অবাক্! স্বভাবটিও কি করে ঠিক পেলে!

এক ফোঁটা ওই ছোট্ট কচি মানুষটি তো কতো—
হাই তোলারও ভঙ্গিটি ওর ঠিক কি তোমার মতো!

এমন করে চায় ও পাজি, মুচকে এমন হাসে—
আমার চোখে তোমার ছবিই ছোট্ট হয়ে ভাসে!

আঃহ্! কী করো! ধন্যি বাপু! এতও তুমি পার!
ছেলের সাথে সমান আদর সাজে কি তার মারও?

মনের মতো

তোর অত খোঁজে কাজ কি কাজলি!...শেষে যদি বলে দিস?
বোস্ বোস্—আহা উঠছিস কেন? এত অভিমান! ঈশ্!
মনের কথাটি শোনাব, কিন্তু গা ছুঁয়ে দিব্যি কর্—
কাউকে এ কথা বলবিনি তুই, এমন কি তোর বর।

আমি চাই ভাই খুবই সাদাসিধে, নয় আকাশের চাঁদ!
আই-সি-এস বা রাজা জমিদারে একটুও নেই সাধ!
কিন্তু তা বলে যার-তারে গলে দিতে তো পারিনে মালা!
বিয়ের বাঁধনে জানিস তো মনে মেয়েদেরি বেশি জ্বালা!
ছেড়ে দিয়ে লাজ খোলাখুলি আজ কানে-কানে বলি তোর,
মনের মানুষ কেমনটি হলে মনোমতো হবে মোর।
পুরুষ মানুষ লম্বা চওড়া চেহারাটা হওয়া চাই!
রঙটা শ্যামলা, মুখখানি ভালো, এ হলেই হল ভাই!
রূপনগরের রাজপুত্তুর খুঁজচিনে তাই বলে!
নেহাৎ কুরূপ না হলেই হল, চলবে সুশ্রী হলে।
শুধু আমি ভালোবাসি নাকো কালো, বেশি রোগা—বেশি মোট
বেঁটে মোটা লোক দেখলে আমার মনে হয় যেন—লোটা!
দেখতে পারিনে দু-চোখে পুরুষ—মেয়েলি চেহারা যার—
ফিনফিনে সরু ক্ষীণ দেহ যেন লীলায়িত লতিকার!
লেডিজ প্যাটার্ন পুরুষগুলোকে অসহ্য লাগে দ্যাখা,
হাড় জ্বলে ওঠে শুনলে তাদের মিহিকথা ন্যাকা-ন্যাকা!
স্বাস্থ্য-উজল সুস্থ-চেহারা ফিগারটা ভালো চাই!
পুরুষমানুষ, সবল সুঠাম এই হলে হল ভাই।
কিন্তু তা বলে চাইনেকো আমি বক্সার পালোয়ান,
গুন্ডামার্কা যন্ডা চেহারা, প্রকান্ড শা-জোয়ান।
কুস্তিগিরের মস্ত ভুঁড়ি কি স্যান্ডোর বাইসেপ—
বাড়াবাড়ি কিছু ভালোবাসিনেকো, মাঝামাঝি হবে স্রেফ।
আরও বলি শোন, হাসিসনে অত বসে খালি ফিকফিক,
—টেকোমাথা লোক দেখলে আমার থাকেনাকো মাথা ঠিক।

ছোটবেলা থেকে চাঁটিয়ে এসেছি টেকোমাথা কাছে পেলে,
সেই টেকো বর নিয়ে করা ঘর চলবে না আজ এলে।
কিন্তু তা বলে বাবরিচুলেরও নই 'ফ্যান' কোনদিন,
ঝাঁকড়া শিথিল কাব্যিক কেশ এলোমেলো তেলহীন,
চোখ-চাপা-দেওয়া টেরির বাহার—দেখে দেহ জ্বলে যায় ;
ভালোবাসি চুল ভদ্র ফ্যাশানে যত্নে যে আঁচড়ায়।
লেখাপড়া জানা পণ্ডিত কিনা? কটা পাশ হাওয়া চাই?
—প্রশ্ন তোর শক্ত এবার—দাঁড়া, ভেবে বলি ভাই।
য়ুনিভার্সিটি-মেড ছাপমারা, বিলিতি ডিগ্রি আনা—
স্কলার-ফেলোতে লোভ নেই ততো, বিদ্যে তো আছে জানা!
কিন্তু তা বলে মূর্খকে আমি ভেব না করব বিয়ে।
ঢের ভলো ঘর-করা তার চেয়ে ওরাং-ওটাং নিয়ে।
ডজন হিসেবে পাশ করে যারা চিনতে তো নেই বাকি।
সে সব বুকিশ বুর্জোয়াদের আসলে সবটা ফাঁকি।
হরফের হার চাইনেকো আমি, বরমালা বিনিময়ে।
অ্যালফাবেটের ফেটিশ যাদের এড়াই তাদের ভয়ে।
আমি চাই যার জ্ঞানের আলোকে উদার হয়েছে মন,
মানুষ হয়েছে সত্যি যে পড়ে, যথার্থ সজ্জন,
গ্রাজুয়েট হলে ভালো হয়, ত—বে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ—
পেলে খুবই ভালো, যদিও জানি তা নকলনবিশ চীজ!
কী বললি! তার আর্থিক আয় কত হলে খুশি হই?
জানিস আমার হালচাল সবি, প্রিন্সেস আমি নই?
টাকার কুমির মিলিওনেয়ার না হয় না-ই বা হল।
ঐশ্বর্যের মোহ নেই মনে। তবে যদি কথা তোল—
খুলে বলি ভাই—থাকে যেন তার মোটামুটি কিছু আয়—
নির্ভাবনায় স্বচ্ছলে যাতে সংসার চলে যায়।
মাস গেলে যাব মাইনেটি এলে তবেই চড়বে হাঁড়ি,
এ রকম বরে ভরসা করাটা হবে নাকি বাড়াবাড়ি?
বলা তো যায় না শরীরের কথা, কিছু নেই বিশ্বাস
যদি মাস-ছয় পড়ে বিছানায় তবেই সর্বনাশ।
যাবে একে-একে গায়ের গহনা, বাড়ি দিতে হবে বাঁধা
করতেই হবে নিজেই তখন বাসনমাজা ও রাঁধা!
শুধু রোজগারি হলেই হয় না—ওই এক মহা ভয়।
আপদ বিপদ আছেই তো লেগে, সংসার সোজা নয়।
ফিউচারটাই ভেবে দেখা চাই বিয়ের ব্যাপারে আগে ;
খালি ভাবে ভুলে ঝাঁপানো অকূলে নভেলেই ভালো লাগে।

'জি পি নোট' ছাড়া ব্যাঙ্কেও কিছু জমা আছে যার ক্যাশ
সাজানো গোছানো নিজের বাড়িটি, মোটর গাড়িটি—ব্যাস।
এ হলেই হবে ; এর বেশি আর লোভ কিছু নেই, ভাই।
...ছেলে-পিলে?—না না—রাতারাতি নয়। দু-একটি, পরে চাই।

স্ক্যাণ্ডাল

রঞ্জা রায়ের ব্যাপার কিছুই জানিসনে তুই ; শোন—
কম মেয়ে নয় আইবুড়ো ওই ধাড়ি!
ওর যে খবর সব জানি—ও রজত রায়ের বোন,
ডোভার রোডের মোড়েই ওদের বাড়ি!
বাপ ছিল ওর বার-অ্যাট-ল বিখ্যাত এস্. ঘোষ,
বেজায় রকম মাতাল ছিলেন শুনি!
স্যার পি. এম.—ঐ চীফ জাস্টিস—পূর্ণমোহন বোস—
জানিসনে? তার ভাগ্নী যে হন উনি!

ধনীর ঘরের মস্ত মেয়ের নাচটা-কিছুই নয়,
—গরিব হলেই উঠত টিটিক্কার!
বাপ বড়লোক! হাকিম মাতুল! কাকেই বা ওর ভয়!
টাকার চাকায় চলচে সবই তার!
ওর দাদা সেই এচ. কে. মিটার—ভাই নয় ওর?...তবে?
ব্লাড্ রিলেশন নেইকো কিছুই.. দ্যুৎ!
দূর-সুবাদের কাজিন-ব্রাদার? হয়তো বা তাই হবে!
ওদের বাড়ির সবই তো অদ্ভুত!

ঐ ভ্যাগাবন্ড এচ. কে. মিটার—নেই কোনো চাল চুলো—
'রাম্ন-লজে' রোজ আড্ডা দেওয়াই কাজ!
...কে বললে? ওর বোম্বে পুনায় ব্যবসা অনেকগুলো?
—ব্লাফ দিয়ে যায়! আচ্ছা তো চালবাজ!
আমার দিদির ননদ রেবার পিসশাশুড়ির মেয়ে
ওদের বাড়ির হাঁড়ির খবর রাখে।
ওই লোফারের জানতো ব্যাপার সেই তো সবার চেয়ে—
পার্ক হাউসের জয়েন্ট ফ্ল্যাটেই থাকে!

ডেন্‌টিস্ট এক ভগ্নীপতির স্কন্ধে করেন বাস,
সেও শোনা যায় অশেষ গুণের লোক!

তার টেবিলেও ভর্তি সদাই হুইস্কি-সোডার গ্লাস,
—মদের নেশায় মন্দ-মেয়ের ঝোঁক!
পতির চেয়েও পত্নী সরেশ! স্মোক করে হরদম—
পেগ টানাতেও আপত্তি নেই মোটে!
যেমন মা তার তেমনি মেয়ে! সেও বড়ো নয় কম
টমবয়! তার ব্রায়াব পাইপ ঠোঁটে!

নাচছে স্টেজে, নামছে স্ক্রিনে, নম্র মোটেই নয়,
হিঁদুর মেয়ের ফিরিঙ্গি চাল সব!
শাড়ির বহর হাঁটুর ওপর—দেখলে যা রাগ হয়!
চুলগুলো তার মুড়িয়ে বানায় 'বব'!
ওর-ই তো বোন বিলেত গিয়েই করলে সাহেব বিয়ে;
কাটল না তার একটি বছর মোটে!
ডিভোর্স করেই ফিরল আবার পার্শি লাভার নিয়ে—
শুনছি সেটাও যায় বুঝি ফের চটে!

বংশটারই দোষ আছে ভাই—ব্যাড-ব্রিডিঙের জের,
পুরুষ মেয়ের লাইসেনশাস্ ওরা!
ভাইপোটা ওর ঠকিয়ে ম্যারাজ করলে সেদিন ফের,
ঐ যে ফাজিল—ডাকনাম যার গোরা!
...ঠিক বলেছিস!—আই. বি. মিটার ; ঐ নামই তার বটে!
গোঁফ-কামানো চটপটে-ভাব খুব!
বিলেত ফেরত নামেই কেবল, বিদ্যে তো নেই ঘটে!
—সাত ঘাটে তাই চোখ বুজে দ্যায় ডুব!

হাড়পাজি ওই আই. বি. মিটার—দেখচি সবাই ওকে
বাচ্চা থেকেই মস্ত এঁচোড়-পাকা,
পাড়ার ভেতর কম বয়সেই গেছল যেভায় বখে ;
—ভাইপো তেমন, যেমন গুণের কাকা!
এচ. মিটাবের মতন এটাও ভীষণ লায়ার জানি,
ব্রাশ করে চুল ঠিক খুড়োরই ধাঁচে।
চোখ মুখটাও এক রকমের দেখতে অনেক খানি
—ঘুরত কেবল ছুঁড়ির দলের পাছে।

বিলেত যাওয়ার খরচ সমেত অনেক টাকার পণে
বাপ দিলে ওর দাঁও মেরে এক বিয়ে।
রঙ কালো, তাই দিলেন সাহেব দূর করে সেই কনে,
বিলেত গেলেন তাদের টাকাই নিয়ে।

সেইখানে এক আইরিশ গার্ল হোটেলওলীর মেয়ে—
করবে ম্যারেজ খবর পেলাম মেলে।
পালিয়ে এলেন বছর বাদেই সেটার মাথাও খেয়ে—
বাচ্চা সমেত মেমকে সেথায় ফেলে।

হেথায় এসেই ছুটত গোড়ায় ব্রাইট রোডেই রোজ,
সেনের শালীর গেছল গোলাম বনে!
নিত্যি সেথায় চলত টেনিস—নিত্যি ডিনার ভোজ—
অনেক কথাই বলত নানান জনে!
সেনের শালীর বল্লরী নাম, বেজায় বিবির চাল—
ছোঁয় না কাপড় ক্রেপ জর্জেট ছাড়া—
চিনলে যেদিন গোরার স্বরূপ—জানলে আসল হাল—
চাবুক নিয়েই করলে সেদিন তাড়া!

বছর খানেক উধাও ছিলেন পশ্চিমে কোন্ দেশে,
সে-দিন হঠাৎ এম্পায়ারের নাচে,
ছিপছিপে এক ফরসা মেয়ের জড়িয়ে কোমর এসে
বসল আমার সিটের খুবই কাছে!
সে-দিন আবার আমার পাশেই চাটুয্যেদের হেনা
তার পাশে সেই চৌধুরিদের রমা।
শুনিসনি ওর প্রেমের রোম্যান্স? জান্‌ত পাড়ার কে-না?
এর স্বামী ভাই করলে সে সব ক্ষমা!

—ওদের ব্যাপার মিস্টিরিয়াস—পাটনাতে ওর বাপ
নামজাদা এক উকিল ছিলেন নাকি!
ওর মা ছিলেন বদ্ধ পাগল, গঙ্গাতে দ্যান ঝাঁপ—
কেউ বলে তাঁর মরার কথাও ফাঁকি!
মাথার বেঠিক—মিথ্যে গুজব—সত্যি তো নয় সেটা,
স্বভাবটা তার খারাপ ছিলই মোট!
স্বামীর বিশেষ বন্ধু কে এক—আসল ব্যাপার যেটা—
হঠাৎ 'ইলোপ'—এইতো পাড়ার ঘোঁট।

অ্যাটর্নি ঐ সুরেশ ঘোষাল—পটলডাঙায় বাড়ি,
যার জুড়ি আর জোচ্চোর নেই দেশে।
উনিই রমার নিজের ভাশুর—বদমায়েসের ধাড়ি!
ভাইপোকে তাঁর তাড়িয়ে দিলেন শেষে!

জানিস না?—ওর বাপ থাকতেই যে ভাই গেলেন মারা
তার ছেলেরই হাতিয়ে বিষয় পরে—

এক কাপড়েই বিদায় দিলেন—চামার এমন ধারা ;
ভাগের সরিক রাখলে না আর ঘরে।

সংসারটাই এমনি রে ভাই, যে-দিকপানেই তাকা
সব খানেতেই চলছে কেবল এই!
জাল জালিয়াৎ ধাপ্পাবাজির প্রধান কারণ—টাকা ;
...ব্যর্থ জীবন অর্থ যাদের নেই।

সন্ধে কখন উৎরেছে?—ঈশ: রাত্রি ঘনায় যে রে!
কথায়-কথায় হয়নি খেয়াল আর।—
...ষাট যদি না-ই পারিস নিদেন পঁচিশ টাকাই দে রে
মাস কাবারেই শোধ দেব তোর ধার!

—থ্যাঙ্ক ইউ! যাই আজকে এখন, যাবার পথেই ফের
মিনার মায়ের খোঁজটা নিতেও হবে!
শুনতে পেলুম চলছে আজও পুলিশ-কেসের জের—
—জানিস কি তুই মিটবে ব্যাপার কবে?
—রঞ্জা রায় আর এচ. মিটারের কান্ডটা ভাই আজ
আধখানা বই হলই না আর শেষ!
আর কোনদিন বলবো এখন—আজকে অনেক কাজ
...কাল সকালেই আসবো আবার? বেশ।

বাসর ঘরে

ওগো ভাই বর! ঘাড় উঁচু করো—মুখ তোল ভালো করে!
অতটা তফাতে বসলে হবে না—বাঁ দিকেতে এসো সরে।
কনের কাছেতে ঘেঁষে ভালো করে পাশাপাশি হয়ে বোসো—
উঁহু, হল নাকো, ওরকম নয় ; দেখিয়ে দিচ্চি রোসো!
এই! এইখানে—এমনিটি করে হরগৌরীর মতো—
বসতে আজকে হয় তোমাদের—শেখাই বলো না কত!
—এই তো হয়েছে! এবার দুটিকে মানিয়েচে ভারি খাসা।
মঙ্গলভাঁড় কড়ির ঝাঁপিটা নিয়ে আয় না লো আশা!
কড়ি খেলানো যে আগে সারা চাই—তারপরে জলযোগ!
—বুড়োদের কথা তুলবিনে কানে, ঐ তো তোদের রোগ!
যা না চট করে উঠে একজন , সবাই জটলা করে
বাড়াসনে ভিড়, সামনেটা ছেড়ে বোস দেখি সব সরে।

গান গাওয়া টাওয়া পরে হবে খন, আগে কড়িখেলা হোক!
নিয়ম কর্ম সারতে দে তোরা...
তুমি তো আচ্ছা লোক!
পুরুষ মানুষ ঢুকেচ বাসরে মেয়েদের এই ভিড়ে?
ওলো চঞ্চলা! শোন্ শোন্! ওর গোঁফ জোড়া দে তো ছিঁড়ে!
ওই দেখ তোর ছোটদাদু এসে ঘোমটা মাথায় দিয়ে
নাতবোয়েদের আড়ালে কেমন লুকিয়ে রয়েছে গিয়ে!
কী লো ছোটবৌ?...এনেছিস সব? রাখ্ দেখি এইখানে।
কড়ি না খেলিয়ে জল খেতে নেই কনের মা কি তা জানে?
ততখনে জুঁই, নিয়ে আয় তুই শরবৎ আর ফল!
—উপোসের পরে মিষ্টি খাবার কার মুখে রোচে বল?
—কী বলছিলি লা? বল্ কানে কানে। বুঝেচি বুঝেচি, থাম!
খাওয়ার ব্যাপারে ঠাট্টা ঠকানো, ছিছি! আরে রাম রাম!
আজকে ও-সব করিসনে তোরা, দয়া কর একটুকু!
ওমা দ্যাখো! দ্যাখো! ছুঁড়িদের যেন তুবড়ির মতো মুখ!
—সারারাত আজ ঘুমুতে দিবিনি? বাসর জাগবি নিয়ে?
ওকি! ওকি! লীলা! পালালি যে বড় কান দুটি মলে দিয়ে?
শোন ভাই বর! আমি কে, তা জান? নিজে দিই পরিচয়!
অনিতারানীর 'দিদু ভাই' হই, সঠিক দিদিমা নয়।
সম্পর্কটা দিদিশাশুড়িই দাঁড়ায় যদিও বটে!
দিদুর বদলে দিদিমা বললে যাবই কিন্তু চ'টে!
কর্তা আমার আজও ছোকরাটি, কোঁকড়ানো কালোচুল!
বুড়ি বলে ভাই আমাকে তোমার হচ্চে কি কিছু ভুল?

হলুদ ছোবান এই চালগুলি মিশিয়ে কড়ির সাথে
আলপনা আঁকা খালি ভাঁড়গুলি ভরো তো নিজের হাতে!
ভালো করে ভাই ভাঁড়ে ভরো কড়ি, পুরো উপ্‌চিয়ে তোল।
ওকি! ওকি! সব ভরা-পাত্রের তুমি কেন ঢাকা খোল?
ও সব ঢাকন খুলবে যে অনি, ঢালবে কড়ি ও চাল!
নইলে তোমার সারাটি জীবন হবে কিসে নাজেহাল?
এ কড়ি খেলার মানে বুঝেচ কি? শোন ভালো করে তবে!
অর্থের কোষ তোমাকে এমনি পূর্ণ করতে হবে।
অনিতা! এবার ভাঁড়ের ঢাকনা রাখ্ দিদি খুলে-খুলে,
চাল-কড়ি গুলো ফ্যাল্ ঢেলে ভুঁয়ে! ফের তুমি রেখ তুলে!
তোমার ডিউটি বারে বারে ভরা শূন্য ভাঁড়ার খানি,
অন্নপূর্ণা হয়ে তাকে ব্যয় করবে অনিতারানী!

ওকি? হয়নি তো! মোটে পাঁচবার ভরা আর ঢালা হল!
আরও যে দুবার বাকি আছে ভাই! নাও ফের কড়ি তোল!
কর কি! কর কি! আরে অত জোরে ঢাকনা নেড় না ভাই
আওয়াজ হলে যে দুজনে ঝগড়া লেগে রবে হামেশাই।
আচ্ছা, এবার হয়েচে! ও টুনু! সরিয়ে এ-গুলো নে না!
মেজোপুঁটি! তুই জলখাবারের থালাখানা এনে দে না!
ওঠ না ইন্দু! গোলাপ ছড়িয়ে বরফের গুঁড়ো দিয়ে
শ্বেত পাথরের গেলাসেতে আগে শরবৎ আয় নিয়ে।
আহা! চোখমুখ শুকিয়ে গিয়েছে! বেচারি বর না চোর!
ওলো বুলি! থাম! ঝাঁপাসনে অত! বড় বাড় দেখি তোর!
ঠান্ডা একটু হোক বর-কনে! গলাটা ভিজুক আগে!
তারপরে তোরা যা খুশি করিস! এখনি কি ভালো লাগে?
জলখাবারটা এনচিস রেবা? ওটা কী? আইসক্রিম?
শরবত বুঝি আগে আনলি নে বুদ্ধি ঘোড়ার ডিম!
—এই যে এনেচে! ও ভাই অনিল! ঘোলটুকু আগে খাও!
একলা কিন্তু খেয়ো না সবটা, অনুকে প্রসাদ দাও!
নিজে হাতে তুমি গেলাসটি ভাই তুলে ধরো ওর ঠোঁটে!
বা রে! ওকি? না না! ও-রকম করে ধরলে হবে না মোটে।
বাসর ঘরের শাসন জানো তো? ক্ষুরের চেয়েও ধার?
ভালো ছেলে হয়ে কথা যদি শোন, তবে পাবে নিস্তার!
এই ঘোল খাওয়া শুরু হল জেন আজকের রাত থেকে।
অনিতার হাতে ঘোল খেয়ে খেয়ে কাঁচা চুল যাবে পেকে!
হলুদ সুতোর হাতে বেঁধে আজ এসেচ দুব্বোঘাস ;
—মানে জান ওর? তাও জাননাকো? মিছে এম-এ বি-এ পাশ।
বিয়ের পরেতে যত দিন যায় ছেলেপুলে যত বাড়ে,
ঐ দুব্বোই ক্রমে ধীরে-ধীরে গজায় বরের হাড়ে!
হ্যাঁ ভাই! তোমার রাশি কী বল তো? সিংহ? কখন নয় ;
মুখ দেখে আমি বলে দিতে পারি, মেষরাশি নিশ্চয়।
হাতে তো তোমার দিব্যি জাঁতিটি! সুপুরি কাটতে পারো?
ছোট্ট রুপোর জাঁতিখানি বেশ! মন্দ নয়তো ধারও!
পানের বটুয়া সাথে আছে নাকি? রয়েছে যখন জাঁতি!
সুপুরি টুপুরি কাটতে জানো কি? ঈশ্! পারবে, না হাতি!
...আচ্ছা, লোহার ধারালো জাঁতিই দিচ্ছি না হয় এনে!
দেখি তো কেমন সুপুরি কাটতে পার তুমি এইখেনে!
ওমা! সত্যি তো! অনুর বরটি দেখচি বেজায় বীর!
কচ করে ভুঁড়ি-ফাসিয়ে দিয়েচে অত বড় সুপুরির!

জলখাবারের থালাখানা ভাই এইবারে নাও টেনে!
আজকে আমরা যা কিছু বলব, নিতে হবে সব মেনে।
আধখানি খেয়ে বাকি অর্ধেক কনের মুখেতে দাও!
ওকি! সবটাই ওকে নয় ভাই, তুমি আগে নিজে খাও।
আচ্ছা হয়েচে। শোন্ অনু! তোর আধখানি সন্দেশ
অনিলকে দে রে! আচ্ছা তো মেয়ে! ভারি দুষ্টুর শেষ!
—হাতে দিলি কেন? খাইয়ে দে ওকে! আজ রাতে দিতে হয়!
কথা না শুনলে বর দেবে তোর কান মলে নিশ্চয়!
—ওকি ভাই বর? আইসক্রিম কি খাওনাকো তুমি মোটে?
তাড়াতাড়ি কেন রাখলে নামিয়ে, একটু ঠেকিয়ে ঠোঁটে!
আহ্! ছুঁড়িগুলো কী যে হাসে খালি! তোরা সব বড় পাজি!
আইসক্রিমেতে নিশ্চয় কিছু করেছিস কারসাজি!
—কী বলচ ভাই?...আইসক্রীমটা লেগেচে বেজায় তেতো?
ওমা সেকি কথা! দেখি, দেখি, ওটা এ-ধারে এগিয়ে দে তো!
...কুইনাইনের গুঁড়ো মিশিয়েচে? ওমা ছি-ছি! মরে যাই!
আহা! মুখে দিয়ে কতই না জানি কষ্ট হয়েচে ভাই।
বার-বার করে বারণ করেচি, খাওয়ার জিনিস নিয়ে
ঠাট্টা তামাশা করিসনে তোরা। ময়দার ডেলা দিয়ে
সন্দেশ ওরা গড়েছিল, জানো?—দিলুম সে সব ফেলে!
পানের ভিতরে দিয়েছিল নাকি লঙ্কা-মরিচ ঢেলে!
—কার এই কাজ, বল শিগগির!—তুই বুঝি, হ্যাঁ রে বাণী?
সকলে মিলেই ষড় করেছিলি, কেউ কম নোস জানি।
আজকে বরকে মিষ্টি না দিয়ে তেতো যারা মুখে দিলি,
ওর কাছে তারা পাবি তেতো কথা! সেজে আন্ মিঠেখিলি!
পানটা চিবলে তেতো কেটে যাবে! খাও না আদপে পান?
শোন ওরে! তবে লঙ্গ-এলাচ সুপুরি মশলা আন্!
...জ্বালাসনি ওকে 'গান-গান' করে, খুকনি! বাদল, এণা!
তোরা নিজে কেন গা না বসে বাছা! ও এখন পারবে না!
মন্টু, কাজল বেলা তিনজনে ধর্ না রে সেই গান—
'—আজি আনন্দ সাগরেতে ভাই এসেছে মোদের বান!'
ও ভাই অনিল! তোমার সঙ্গে করে দিই পরিচয়!
—এই যে দেখচো ছোট্টো মেয়েটা, এটি ক্ষুদে শালী হয়।
ক্ষুদে পিঁপড়ের মত এটির কুটুস কামড় বুলি।
নাম শোভারানী—ডাকনামটাও বলে দিই তবে?—দুলি!
দুলি বললেই ভারি ক্ষেপে ওঠে—এইটুকু জেনে রেখ!
দেখ তুমি যেন 'শোভারানী' ভুলে দুলি বলে ডেকনাকো!

এইটি তোমার শ্রীমেজ শালাজ, অনির বৌদি হন!
এই রূপসীটি ছোট বৌদিদি, কেওকেটা বড় নন।
ভালো করে ভাই চিনে রাখ ওই চশমাধারিণীটিরে!
জ্যাঠতুতো বড় বৌদি তোমার, ওঁরি কাছে ঘুরে ফিরে
আনাগোনা পরে করবে তোমরা উনিই পালের গোদা
বাড়ির কর্ত্রী!—আরে এসো এসো এ-ধারে—মিসেস্ ভোঁদা–
চিনে রাখ এঁকে, কর্তার এঁর যদিও ভোঁদাই নাম,
তবু তিনি ক্ষীণ, গৃহিণীর বপু দিয়েছে নামের দাম।
ফিরোজা রঙের ক্রেপ শাড়িপরা ছিপছিপে ঐ মেয়ে,
—পালাল! পালাল! ঐ উঠে যায়!

ভালো করে দ্যাখ চেয়ে!

চিনে রেখে দাও ঐ মেয়েটিকে, ভুলোনাকো মুখখানা!
ডান গালে তিল, কোঁকড়ানো চুল, চেহারাটি সরুপানা!
আজ রাতে উনি শালিশালাজের দলে মিশে বেমালুম—
দিয়েচেন জুড়ে বাসরজাগানি হাসিতামাশার ধুম!
কাল থেকে ওঁকে ভব্যসব্য মাসশাশুড়িটি পাবে।
'বাবা' 'বাছা' বলে জামায়ের সাথে আলাপ করতে যাবে।
নীল বেনারসী-ধারিণী ঐ যে—ঐ ধারে চাও সোজা।
পিয়ানোর পাশে বসেছে, খোঁপায় রজনীগন্ধা গোঁজা!
ওই মেয়েটিকে চিনে রাখ, ওটি 'অনি'র প্রাণের সখী!
এ ওর বিরহ পারে না সহিতে, দুটি যেন চখাচখী!
একই ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়ে খুব ছোটবেলা থেকে!
ম্যাট্রিক পাশ করেচে দুজনে একই নম্বর রেখে!
বুঝেচ অনিল? ঐ নীলিমাটি শত্রু তোমার বড়
অনির প্রাণের সব ভালোবাসা ওরি কাছে আচে জড়ো!
—ঈশ! ঘোমটার আড়ালেও কনে বেজায় রাঙায় চোখ!
দেখাব নাকি লো ডেকে এনে তোর শ্বশুরবাড়ির লোক?
দ্যাখো তো অনিল! কনের তোমায় লজ্জার নেই লেশ!
কিল মারবার করেছে ইশারা, ঘোমটা আড়ালে—বেশ!
—এসো না নীলিমা এ-ধারেতে সরে, কেন বসে দূরে অত?
বন্ধুর বর দেখচ কেমন? হয়েচে মনের মত?
ইন্ড্রুস—না-না—ইন্ট্রোডিউস্—কী যেন কী বলে ছাই!
ইংরিজি কথা মুখ দিয়ে পোড়া বেরুতে চায় না ভাই!
বোধোদয় বধি বিদ্যে তো মোটে, আমরা কি অত জানি?
ইনট্রোডিউস করানোর কেতা শিখিনি মুখ্যু প্রাণী।
নিজে থেকে করে নেনা রে নীলিমা পরিচয়-টবিচয়!
তোরাই লজ্জা করলে বাসরে আমোদ কী করে হয়!

অনুর দিদিমা আসছেন ওই!

এতখনে এলে দিদা?

অনিল! প্রণাম করো এঁকে ভাই—

(আছে এক অসুবিধা,

বেজায় রকম কানে কালা বুড়ি। পায় না শুনতে কিছু!
সবই বলা চলে সামনেতে ওঁর, স্বরটা করলে নিচু।
প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে এবার আলাপ করাটা চাই
দিদিশাশুড়ির সঙ্গে তোমার—নইলে হবে না ভাই!)
শুনচ অনিল? বলচেন দিদা—কেমন লাগচে কনে?
নাতনিকে ওঁর পছন্দ বেশ হয়েচে তোমার মনে?
—এই অনি! ঘুমে ঢুলিসনি—শোন দিদা কী বলচে তোকে,
—শুভদৃষ্টির সময় বরকে ভালো তো লেগেচে চোখে?
হাসলে হবে না, বলচেন দিদা, 'হাঁ না' বল ঘাড় নেড়ে।
উত্তর দাও দুজনে এবার—মজাটি হয়েচে বেড়ে!
ওকি ওকি দিদা—নিরীহ বরের মলে দাও কেন কান?
ও-সব নিয়ম নেই আজকাল। বরং নিধুর গান
গাও দেখি বসে, শুনব সবাই টপ্পা তোমার মিঠে
আঃ--! কে রে ওটা? ঢুলে-ঢুলে খালি পড়িস আমার পিঠে!
ঘুমুবার দফা রফা হল আজ! আরে কী সর্বনাশ!
কমলা এনেছে ক্যারম ও লুডো, নীলিমা এনেছে তাস!
গানে-গানে একে কানে লাগে তালা, এর পরে ফের খেলা!
—না বাবা! এবার পিঠটান দিই! আসব সকালবেলা!
রাত পোহাবার দেরি নেই আর, না গড়ালে একটুকু
উঠতে কালকে পারব না মোটে! শোন্ শোন্ এই খুকু!
গোটাকত পান একটু জর্দা আমাকে দেনা রে এনে!
—ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে পায়েতে আমার—ধরত কমলা টেনে!
—আচ্ছা, তাহলে উঠলুম আমি—'গুডনাইট'টা বলি!
বাসরজাগানি দিয়ো ভাই বব! এবার শয়নে চলি।

রুদ্ধ গৃহে

লজ্জা আমার করে নাকো বুঝি? বলতে পারি না, যাও!
বা—রে! বেশ লোক! উঠে গেলে রেগে? শোন শোন মাথা খাও!
বলব বলব, আচ্ছা, বলচি, ভালোবাসি! ভালোবাসি!
—হয়েচে এবার? এসো কাছে এসো। ফুটেছে তো মুখে হাসি?

বাব্বা! এত রাগ! অভিমান এত! আসবে না কাছে? ঈশ্‌
বেশ! থাকো তবে! তোমার ডিক্রি হয়ে গেল ডিসমিস!
আঃ—! সরে যাও! এখন আমার বড্ড পেয়েছে ঘুম!
ছুঁয়ো না বলচি! ভালো লাগেনাকো! চাইনে তোমার চুম!
—হয়েচে, হয়েচে ঢের!
খামকা বাধিয়ে ঝগড়া বিবাদ, ভাব কেন সেধে ফের?

—কথা আছে কিছু? বলো না, শুনচি। ওদিকে ফিরব? কেন?
কানে কালা নই। এ পাশে থেকেও·শুনতে পাব তা জেনো!
খিল দেওয়া ঘরে কেউ নেই—তবু চুপি-চুপি ভালো বলা?
—পুরুষ হয়েও শিখেচ দেখচি-অনেক রকম ছলা!
খু—ব কাছে গেলে তবে বলা চলে? কানে-কানে মুখ রেখে?
ভয় করে, পাছে আড়ি পেতে কেউ শোনে বা আড়াল থেকে?
কী এত গোপন কথা সেটা শুনি? ঠাট্টা নয়তো? বলো?
বিশ্বাস আর হয় না তোমাকে, নাক কান আগে মলো!
—আচ্ছা, যাচ্চি কাছে,
এই তো এসেচি! বলো চটপট, কী তোমার কথা আছে?

আঃ! ভারি বদ স্বভাব তোমার! আমি কি বিয়ের কনে?
কানে-কানে কিছু কথা আছে বলে—এই বুঝি ছিল মনে?
সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছাড়া মুখে?—সাহস বেড়েচে ভারি।
রোসো তো! দেখাই মজাটা! ভেবেচ, আমি কী করতে পারি?
এত প্যাঁচ আছে পেটেতে তোমার—কে জানত বলো আগে?
ঠকানোয় দেখি তোমার কাছেতে ঠগীরা বা কোথা লাগে!
সিগ্রেট্‌ খাওয়া বিদ্যে তোমার বলে দি বাবাকে গিয়ে—
টেরটি পাবেন বাবুটি তখন! বেরুবে ও-সব ইয়ে!
—যাও, শুনব না কিছু,
ধোরো না আঁচল, ভালো হবেনাকো! এসোনাকো পিছু পিছু!

উঁহু—হুহু—হুহু—অত বেশি জোরে টেনোনাকো বড় লাগে!
আচ্ছা যাব না—বসচি বসচি, হাতখানা ছাড় আগে।
কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে আমারি মাথায় বাজ।
বই পড়া ছেড়ে বৌয়ের পেছনে হরদম লাগা কাজ!
—না পড়েই তুমি পাশ হবে বটে—বুঝতে পারচি বেশ।
তুমি হবে ফেল, মাঝ থেকে লোকে আমাকে দুষবে শেষ।
কী বইটা ওটা গো? দেখি? ও—বুঝেচি! ফরাসি নভেলখানা।
মুখ টিপে অত হাসি কেন শুনি? ও বই আমার জানা!
ভেবেচ কি বুঝিনাকো?
চোরের মতন ও বই কেন যে এ ঘরে লুকিয়ে রাখ?

ছিছি—ছিছি—মাগো—তোমরা দেখচি দুনিয়ায় সবি পারো।
—অমন গল্প বলতে কি মুখে বাধচে না একবারো?
বইতে ও সব লিখেচে কী করে? না—না, ও সত্যি নয়!
কখনও সব লেখা নেই, তুমি বানিয়েচ নিশ্চয়!
মুখে-মুখে তুমি গল্প বানাতে খুব পটু—আমি জানি!
—সত্যি হয় তো, পুড়িয়ে ফেলোগে এখুনি ও বইখানি।
যাঃও! শুনব না ও সব গল্প! থাম, থাম! চুপ কর!
পুরুষ মানুষ এত অসভ্য! বেহায়া এমনতর!
খুলেচ ও বই ফের।
যত আজে বাজে ইয়ার্কি বুঝি লাগে ভালো তোমাদের?

হাসতে হবে না ঠোঁট টিপে-টিপে—মোটে ভালোবাসিনাকো!
দাও ছেড়ে দাও, চলে যাই আমি! একলা এ ঘরে থাক।
দিন-দিন তুমি হচ্ছো এ কী যে! একটু আবরু রাখ!—
পাশের বাড়ির ছাদ থেকে সব দেখা যায়, জাননাকো?
ওগো ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি! আমি ধরচি তোমার পায়!
এমন বিষম আদরের চোটে গরিবের প্রাণ যায়!
সরো, হাত ছাড়ো, যায় খোঁপা খুলে! গেল বুঝি ভেঙে শাঁখা!
আর কক্ষনো ঢুকব না ঘরে, রকমারি কাছে থাকা!
নাকে খৎ, আর নয়!
পাশের খবর পেলে আমি বাঁচি! কী যে হবে সেই ভয়।

ননদ-ভাজে

ফুলশয্যার আলাপের কথা
বলতেই হবে তোকে?
বেজায় ফাজিল মেয়ে তো দেখছি!
একেবারে গেছ বখে!
সব না শোনালে ঠোনা দেবে গালে?
কানও মলে দিতে পার?
কারণ, সনদ পেয়েছ 'ননদ'
সুতরাং পোয়াবারো!
বলে কতবার টান মেরে যায়
এলো খোঁপা দিছি খুলে!

এক বাসে চড়ে এক ক্লাসে পড়ে
কাটালুম ইস্কুলে!
সেই তিনি এসে ননদিনী বেশে
শুরু করেছেন দাবি—
বেশি দিনে চাল করব নাকাল,
ঘা-কতক বুঝি খাবি?
চুপ-চুপ হেনা! -স্ক্রিন টেনে দে না!
কারা আসে সারি-সারি!
ঘোমটা-টা টানি, বলবে কী জানি
বৌটা বেহায়া ভারি।

পুবের মহলে গেছে ওরা চলে?
—যাক! বাঁচা গেল! বাপ!
কনে বৌ সাজা—হাড় ভাজাভাজা
জ্বালাতন! মহাপাপ!
শুনেচি এবার নাম ধরা আর
চলবে না তোকে নাকি?
'ঠাকুরঝি' বলে ডাকতে তাহলে
মকশো করতে থাকি?
চোপ! ফের যদি বলবি—'বউদি'
এক কিল দেব পিঠে!
একদিনকার নামটা কি আর
লাগছে না মুখে মিঠে!
এতকাল ধরে হুটোপাটি করে
এল যারা একই ক্লাশে,
সেই তারা আজ ননদ ও ভাজ—
ভাবতেও হাসি আসে

কী বলেচে রাতে, মনে নেই প্রাতে,
—সত্যি নেইকো মনে!
তুমিও এমন ভুলে যাবে খন
বনলে বিয়ের কনে!
বিশেষ এ-ছাড়া আইবুড়ো যারা—
তাদের শুনতে নেই
ফুলশয্যার গোপন লজ্জা!
..আরে শোন্ শোন্! এই!
—সত্যি কি চটে? কী বুদ্ধি ঘটে?
—করছি রগড় শুধু!

বলব কী করে? রয়েচে যে ঘরে
মন্টু বাদল বুধু!
ছোট হোক যত বোকা নয় ততো,
শোনা কি উচিত, বল্?
আয় তার চেয়ে ও ঘরেতে যেয়ে
দুজনে বসিগে চল্!
নিরিবিলি কোণে আরামে দুজনে
গল্প করব, বেশ?
...এম্‌ব্রয়ডারি? ওতো কাজ ভারি!
—রাখ, পরে হবে শেষ!

—প্রথমে কী হল? কে কথা কইল?
থাম থাম, রোস বলি!
আগে তোর দাদা—চুপ! ঐ খাঁদা
আর আসে বুঝি কলি?
ওদের সামনে বলতে চাইনে
কালকের কোন কথা।
পার তো সরাও ওদের কোথাও,
'ঠাকুরঝি'! থুড়ি! লতা।
নড়বে না আর, যদি একবার
দ্যাখে আমি হেথা আছি।
সারদিনভোর ভ্যানোর-ভ্যানোর
করে যেন ঠিক মাছি!
লাগে জ্বালাতন! বিশ্রী এমন!
ঘুমুতে দেয় না দিনে!
ভালো করে তাই ও দুটিকে ভাই
সভয়ে রেখেচি চিনে।

রত্ন-দুটিরে ফন্দি ফিকিরে
সত্যি সরালি শেষ?
খুব মেয়ে বটে! আছে দেখি ঘটে
বুদ্ধি এখন বেশ।
দোরটায় হেনা! ছিট্‌কিনি দেনা!
যখন তখন যে-সে—
ঘরে ঢুকে পড়ে ঘাড়ে এসে চড়ে
রসিকতা করে হেসে।
মুস্কিল এই নিস্তার নেই
খিল এঁটে দিয়ে ভাই,

ডাকাডাকি করে পাছে কেউ দোরে
ঠেলা দ্যায়, ভাবি তাই
তার চেয়ে ভাই, চল্ ছাদে যাই,—
দিব্যি সুবিধে হবে
নিরাপদ সে-ই! চল্ সেখানেই
বসিগে দুজনে তবে!
ছাদটি তো তোফা!—না-ই থাক্ সোফা
—আঃ—হ্! ভারি মিঠে হাওয়া!
তবু সবধার খোলা নেই আর—
হোগ্‌লা ম্যারাপে ছাওয়া!

..আবার জ্বালালি? একই কথা খালি?
শুধু 'বল্' আর 'বল্'!
সিঁদুরে কাজলে ভবি কিগো ভোলে?
যতই করি না ছল!
সারারাত দিদি তুমি ও মণিদি
ছিলেই তো পেতে আড়ি!
ঘুম থেকে উঠে এলে ফের ছুটে
কী শুনতে তাড়াতাড়ি?
দর-দালানেতে ছিলে আড়ি পেতে—
জেনো আমি সব জানি!
শুনেচ তো সবি, তুমি আর ছবি—
আরো বুঝি ছিল, রানী!
দরজায় গায়ে অসৎ উপায়ে
করেছিলে জোড়া-ফুটো!
দিনে তালি দিয়ে দিব্যি বুজিয়ে
রেখেছিল ছ্যাঁদা দুটো।
ওই ফুটো দিয়ে দুটো চোখ নিয়ে—
দেখা যায় সারা ঘর!
শোনা সবি যায় দাঁড়ালে হেথায়
—খু-ব আস্তেও স্বর!

শখ বটে প্রাণে! তোমরা ওখানে
মশার কামড় খেয়ে
রইলে কী করে সারারাত ধরে?
—সাবাস ডাকাতে মেয়ে!

রাত জেগে শীতে আমারো চাইতে
তোরি চোখে বেশি কালি!
বারে-বারে তাই সকালেও ভাই
পড়ছিস ঢুলে খালি।

আড়ি পাতবার খবর তোমার
কে দিয়েচে ভেঙে?—ঈশ!
বলব তা কেন? 'বৌ' বলে যেন
ঈডিয়ট্ পেয়েছিস?—

নতুন মা

হেসে-হেসে গেল পেটে খিল ধরে—বাপ্!
একরতি ছেলে ওই, একি তার দাপ্!
হাত পা তো কচি ফুল, নড়বড়ে ঘাড়
সারা বিছানাটা তবু করে তোলপাড়!

ওগো—ওগো! শিগগির এসে দেখে যাও!
রাখ বাপু লেখাপড়া! এসো, মাথা খাও!
পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি! এসো একবার,—
এ ছেলে তো নিয়ে আমি পারিনেকো আর!

অদ্ভুত বুদ্ধি যা—দেখে লাগে তাক্!
হাত থেকে কেড়ে কিছু যদি বলি—রাখ্!
মুঠি এঁটে ঠিক সেটা চেপে ধরে রয় ;
'ন্-ন্—না-না' বলে সে যে কত কথা কয়!

অত ভারি ওর সেই নেটের কভার
ঘুমোলে বিছানা ঢেকে দিই যতবার—
বললে হয়তো তুমি ভাববে এ মিছে
—লাথি মেরে খোকা রোজ ফেলে দেয় নিচে।

এই দ্যাখ! উঠ্চি যে—বুজেচে তা ঠিক!
আঁকড়ে আঁচল ধরে হাসে ফিক্-ফিক্
—এই বোকা! খাস্‌নিকো কাপড়ের কোণ!
বমি হয়ে যাবে- পাজি! না-না—জাদুধন!

বিষম চালাক বাপু তোমাদের খোকা
আমি নিজে ওর কাছে বনে যাই বোকা
দিন-দিন বেড়ে চলে দুষ্টুমি যত
অথচ মুখটি দ্যাখো!—যেন ভালো কত!

লোক চেনা শিখে গেছে, দেখনি তো মজা,
বুঝতে পারে ও ঠিক, যেই আসে ভজা
ককিয়ে কেঁদে যা ওঠে রেগে একেবারে!
ও ছোঁড়া কি এ ছেলেকে সামলাতে পারে?

গেল-গেল!...ভাঙলে গো! ঝুমঝুমিটাকে!
যা-ই দাও মুখে পুরে চুষবে ও তাকে।
কাঁথাগুলি ন্যাতা হল টেনে ছুঁড়ে ফেলে।
সামলান দায় ওকে, যে দামাল ছেলে!

বুকে হাঁটে ঘরময় পিছ্‌লানি খেয়ে
সে বড় মজার! তুমি দেখনি কি চেয়ে?
এই দ্যাখো সারা ঘরে কী করে ও ঘোরে,
ধরো, ধরো, মাথা ঠুকে যায় বুঝি দোরে!

না—না—ছাড়ো, চুপ করে দ্যাখ ও কী করে?—
ওমা! ওমা! হামা টেনে ঘুরছে যে ঘরে!
উঁচু খাটে শোয়ানো তো চলবে না আর!
কখন কী করে বসে—ঠিক নেই তার!

তুমি বলো আমি করি কেবলি নালিশ—
দেখচ কি কান্ডটা? পাশের বালিশ
অত বড়, ভারি, মোটা, তাকে ঠেলে ঠেলে—
মেঝেতে ফেলেচে ওই একফোঁটা ছেলে!

নাওয়া খাওয়া নিয়ে ওর রোজ মারামারি
হিমসিম খেয়ে যাই, একলা কি পারি?
ধরো দেখি একবার, দেখে আসি ছুটে,
ভাঁড়ারে রাঁধুনি বুঝি নিলে সব লুটে!

কী করে হল গো এটা এমন ডাকাত?
ভয় ডর নেই মোটে!—সবেতেই হাত!
পিছন ফিরছ যদি পলকে চোখের
অমনি যা হোক ক্ষতি করেছে লোকের!

একবার দু মিনিট যেই উঠে গেছি
অমনি ডুকরে উঠে করে চেঁচামেচি
সবটা মোজার বোনা টেনে দেছে খুলে!-
গিয়েছিনু রেখে ওটা পাশে ওর ভুলে!

'ক্ষুদে শত্তুর' সাধে বলেছি কি তাই?
যা কিছু পড়বে চোখে, তক্ষুনি চাই
টেনে ছিঁড়ে মুখে পুরে চেটে চুষে শেষে
দফা রফা করে বাবু ফেলে দেয় হেসে!

তবে রে দুষ্টু। দেব পিঠে এক কিল!
দ্যাখো মজা! যত বকি, হাসে খিল-খিল!
উহু-হু-হু—লাগে—লাগে! ওরে! ছাড়্ চুল—
—ওরি ভয়ে কানে আর পরিনে তো দুল।

তুমি বলো আজকাল বদ্‌লেছ বীন্।
কেশ-বেশ কমছেই ক্রমে দিন-দিন!
বুড়ি বনে যেতে দেখি বড় বেশি তাড়া!
যোল বছরেই যেন দিদিমার বাড়া!

তোমার কি! খাও দাও যাও কাছারিতে!
হয় না তো এ বাবুর ঝক্কিটি নিতে!
বুড়ো হয়ে পড়ি সাধে? না পেরোতে যোল?
এখন যে 'মা' হয়েচি, সেটা কেন ভোল?

জান না তো সাজা-গোজা কেন পারিনাকো
বুঝবে তা হাড়ে-হাড়ে বাড়ি যদি থাকো!
চুল-টুল আঁচড়িয়ে যেই রোজ সাজি—
অমনি হাঁটকে দেয় এই ছেলে পাজি!

টিপ্ তো পরার মোটে জোটি নেই আর—
দেখলেই জিভে চেটে খাওয়া চাই তার!
ভাল শাড়ি পরলেই ওঠা চাই কোলে,
ভরে দিতে হিসি, আর বমি, নালে-ঝোলে!

এই হার কতবার ছিঁড়লে ও টেনে,
নেবে না তো আর কিছু—যদি দিই এনে।

আঁচলের চাবি নিয়ে পুরে দেয় মুখে
তোমরা তো হাসবেই!...আছো কিনা সুখে?

মার চেয়ে বাপ বড়?—ঈশ্ তাই নাকি?
দশমাস দশদিন বওয়া বুঝি ফাঁকি?
এ নয়কো তোমাদের আলগোছে চুম্
দিনে ছুটি নেই মার, রাতে নেই ঘুম।

রোগে-রোগে কান্নায় মায়েদেরই দায়।
বাপেরা এ ঝন্ঝাট পোহাতে কি চায়?
ওমা এ কি! খোকা দেখি ঘুমে পড়ে ঢুলে,
চুপ! চুপ! কাজ নেই আর কথা তুলে!

প্রিয় সখী

এবারের ছুটিতে
তুমি নাকি উটিতে
যাচ্ছ বেড়াতে?—হ্যাঁগো, সত্যি কি? বলো না!
আমি বলি তার চে
এপ্রিল মার্চে
কাশ্মীরে এ বছর যাই কেন চলো না!

...ছুটি মোটে পাবে না?
তাই তুমি যাবে না?
কেন? গরমের ছুটি, সে তো আছে হাতেতেই!
...জড়ো আছে কাজ ঢের?
বি-এ এগ্‌জামিনের
দেখবে পেপার—সে তো নিতে পার সাথেতেই!

—আচ্ছা, ও কথা থাক,
চল আজ যাওয়া যাক
আর্ট-এগ্‌জিবিশনে—তাতে আছ রাজি তো?
...হয়ে গেছে তাও শেষ?
কে বলেছে?—নিখিলেশ?
না জেনে ও বলে কেন? আচ্ছা সে পাজি তো!

—হাতে কী এ? মিঠে পান।
খাবে? ঈশ!—অভিমান?
নিজে ডেকে খেতে কেন দিইনিকো এতখন?—
মনে নেই একদম!
তুমিই বা কী রকম?
কেড়ে নিয়ে খাওনিকো, তোমারো তো ভুলো মন!—

এসো খেলি পিংপং,
ওমা! সেকি? একি সঙ!

ছেলেদের খেলা এ যে! —জানোনাকো সত্যি?
নিভা, ইভা বলে ঠিক,
—বর তোর বেরসিক,
খেলাধুলো শেখেনিকো মোটে একরত্তি!

যাবে আজ পার্কে?—
তুমি আমি আর কে?—
...ফণী দে-কে বাড়ি থেকে ডেকে নেবে?—বেশ তো!
মেতে গেলে গল্পে
বেরুবে কি অল্পে?
জমে যাবে ফণীদের বাড়িতেই শেষ তো?

তার চেয়ে চলো যাই
ছাদে বসে গান গাই,
নতুন যে গানখানা বুধবারে শিখেছি।
...কে বলেছে পিলু, দুঃর!
মিশ্র-কানেড়া সুর।
গানের খাতায় এক স্বরলিপি লিখেছি।

প্রথম লাইন যার,
'—ওগো নেয়ে, করো পার
গোধূলির রাঙাধূলি রঙিয়েছে নভপট।'
...এ গানটি ভালো গায়
আমাদের তৃষা রায়?
ধ্যেৎ! সে তো গায় ওটা ভুল সুরে—ছায়ানট!

আচ্ছা, ও-সব থাক।
এস, আজ পড়া যাক
'চিত্রাঙ্গদা' খানা। বহুদিন পড়িনি।
রবি ঠাকুরের বই,
সে পেলে কি কথা কই?
মুখ বুজে ঘরে থাকি, এক পাও নড়িনি।

নাও, পড়ো গোড়া থেকে
শুনি কোলে মাথা রেখে,
রোসো রোসো, খোঁপাটাকে নিই আগে বাগিয়ে।
...ও কি বেয়াদপি! যাও!
পড়া শুরু করে দাও
খুনসুটি করে কেন মিছে তোল রাগিয়ে।

সচিব

খরচ কমানো হুজুগ উঠেছে দেশে—
তোমারো চাকরি যায় যদি এতে শেষে,
যাবেই না হয়।—চিন্তা কিসের অত?
যতই ভাববে, বাড়বে ভাবনা তত।
এতদিন ধরে করেছ চাকরি ঢের—
এখন না হয় মায়াই কাটালে এর!
বয়স তোমার চল্লিশ নয় পুরো!
এখনি নিজেকে মনে করো কেন বুড়ো!

শরীর খারাপ হবে দিনরাত ভেবে—
আমি বলি তুমি ব্যবসায় পড়ো নেবে।
এ গাঁয়েতে নেই ডিস্‌পেনসারি মোটে,
ওষুধ কিনতে সকলে শহরে ছোটে।
ওষুধের ছোটো দোকান একটা খুলে—
চাকরি করার দুর্ভোগ যাও ভুলে।
ভারি তো মাইনে, গোটা সত্তর টাকা!
তার জন্যেতে বন্দীর মতো থাকা!

বেলা আটটার ডালভাত খেয়ে দুটি,
ট্রেন ধরবার জন্যেতে ছুটোছুটি—
রাত আটটার ফের কলকাতা থেকে,
এতে কি কখনো শরীর-স্বাস্থ্য টেঁকে?

কাজ নেই আর চাকরি তোমার করে,—
চৌধুরিদের খগেন বাবুকে ধরে—
চৌরাস্তার মোড়ে একখানা ঘর
ভাড়া নাও তুমি। আমি দেব তারপর
আসবার আর মাল কেনবার টাকা।
...কোথা পাব?—কেন?—গয়নার রাশি রাখা
কিসের জন্যে? কাজেই যদি না লাগে!
—কথা শুনে বাপু হাড় জ্বলে যায় রাগে।

ঘর-খরচায় দরকার ফি-মাসেই?
—সব বাড়িখানা জুড়ে থেকে কাজ নেই।
বার মহলটা সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে
রান্নার ঘর করোগেটে তুলে দিয়ে—

এ বাড়ির যদি ভাড়া দাও আধখানা,
গোটা কুড়ি টাকা মাসে ঠিক পাব জানা।
মনে জোড় নিয়ে লাগ, নিশ্চয়ই হবে।
এই মাসে সব ঠিকঠাক করো তবে।

গৃহিণী

পাঁচটা বেজেছে। কাল এল জল। উঠে পড়ি—দেরি করবোনাকো।
সকাল বেলাই চানটা সারবো—
বেলা হয়ে গেলে আর কি পারব?
ঘর দোব গুলো ঝাঁট-পাট দিক এইবাব ছোঁড়া চাকর 'থাকো'।

কাঙালির মা কি এখনো ওঠেনি? ঝি চাকর সব কোথায় কে যে!
বিছানা না হয় নিজেই ঝাড়ব ;
ভারি আসবাব কী করে নাড়ব?
না—ওদের দিয়ে করাই এ-সব ; ঘর ঝাঁট দিক, মুছুক মেঝে।

পাখিটাব দাঁড়ে ছোলা নেই বুঝি, চেঁচিয়ে মরছে তখন থেকে।
ঢাকা থেকে আজ ন-কাকা আসছে!
...খোকাটা সকালে বেজায় কাশছে!
ওষুধ খাওয়াই ওকে এক্ষুনি...ঠাকুর আসেনি? আনুক ডেকে।

আসছেন কাকা ; তেতলার ঘর ছেড়ে দিতে হবে। গুছিয়ে রাখি।
খান নিরামিষ, কী হবে রান্না?
এখুনি পাঠাই বাজারে—আর না!
ফল টল কিছু আনাই। জানিনে—রাতেতে লুচি খাবেন কিনা!

কলতলাটাতে হয়েছে শ্যাওলা, ঘষিয়ে দেওয়াবো চুনের গুঁড়ো!
—নর্দমাটাও দেখছি বন্ধ!
বেরিয়েছে তাই বিশ্রী গন্ধ ;
কাজে ফাঁকি দিয়ে গেছে আজ, নয়—আসেনি মোটেই ধাঙড় বুড়ো!

কয়লা এবার পাঠিয়েছে কম, আসুক—আজকে বলবো তাকে!
দেখিগে —ঠাকুর এসে কী করছে,
বুড়ি ঝিটা কেন চেঁচিয়ে মরছে?
—উনি ওঠবার আগে সব কাজ সেরে নিতে হবে। বাকি না থাকে।

সর্ষের তেল ফুরিয়েছে, নেই পানের মশলা—আনাতে হবে!
এত বেলা হল আসেনি গয়লা!
কাপড় চোপড় হয়েছে ময়লা,
এই সোমবারে হল দশদিন—ধোবাটা জানি না আসবে কবে!

বাইরের ঘরে চেয়ার সোফার পুরনো হয়েছে কুশনগুলো!
দোবের পর্দা খুলিয়ে কাচবো।
ম্যাগাজিনগুলো মিলিয়ে বাছবো।
আপনি দাঁড়িয়ে আজ দুপুরেই ছবি আয়নার ঝাড়বো ধুলো।

জুতোগুলো ওঁর হয়নি পালিশ, 'ওরে থাকো! শোন কোথায় গেলি?'
ভিজে কাপড়টা ছাদেতে মেলবো ;
'...যাচ্ছি ঠাকুর! নিমকি বেলবো!'
খুকির অসুখ—এত ঝঞ্ঝাটে আজকে হবে না আমের জেলি।

চেঁচামেচি অত করছ কেন ঝি? বলবে যা বল ঠান্ডা হয়ে!
নেইকো মেজাজ গরম করতে।
...রাখাল তোমাকে বলেছে মরতে?
বললেই বা সে, তার কথাতে তো পরমায়ু তোর যাবে না ক্ষয়ে।

আচ্ছা—আচ্ছা, বকে দেব তাকে। রাগ করিসনে, শান্ত হ মা ;
বালকের কথা আছে কি ধরতে।
রোগে-রোগে ছোঁড়া বসেছে মরতে!
দিগে তাকে সাবু ; বয়সে সে তোর ছেলের বয়সী—কর মা ক্ষমা!

বাইরে এসেছে বন্ধুরা ওঁর, চা পাঠিয়ে দিই, নিমকি ভাজি!
ডাকছেন উনি—কেষ্টা যাই কি?
জিগেস করুক, তামাক চাই কি?
বাঃ! ভুলে গেছি! নেমন্তন্ন জামাইকে করে পাঠাই আজই!

বৌদিদি

ছোট্‌ ঠাকুরপো, ছোট্‌ ঠাকুরপো, ও ভাই কবি! শুনছ কি?
দ্যালের গায়ের ক্যালেন্ডারের মেমের দন্ত গুনছ কি?
মিলছেনাকো পদ্য বুঝি তাই কি তুমি চিন্তিত?—
আমার কথা শুনলে তোমার আটকাবে না কিঞ্চিৎ-ও।
দিচ্ছি শোনো যুক্তি শুভ
পদ্য যাতে মিলবে ধ্রুব ;
ছন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব তোমার বন্ধ হবেই সন্দ নেই!—
মন্দাকিনীর সঙ্গে—বুঝলে? সাজলে চেলী চন্দনেই।

আহা—হা—হা, চটছো কেন? মন্দা মোটেই মন্দ নয়,
ও—ও, বুঝেচি! প্রেমের ঠাকুর সকল দেশেই অন্ধ হয়।
কুন্দকে ভাই পছন্দ? তা খুলেই পষ্ট বললে কোন্‌!
তাই তো ভাবচি কেনই ভায়ার হঠাৎ এমন উদাস মন!
গন্ধ-বিহীন কুন্দমালা
ভরল কবির প্রাণের ডালা ;
মন্দারই সে মাস্‌তুতো বোন, রংটি একটু ফরসা বই
এমন কী আর গুণ আছে তার? কাব্যি বুঝবে ভরসা কই?

ঐ যাঃ! চা টা জুড়িয়ে গেল, হালুয়া হল ঠান্ডা হিম।
কলম ছেড়ে খাও তো আগে, পদ্য রাখ ঘোড়ার ডিম।
উঠলেনাকো? শীঘ্রি ওঠো। নইলে খাতা ছিঁড়চি এই,
আমার সঙ্গে পারবে জোরে? এমনি সাধ্যি তোমার নেই।
হালুয়া কেন এমন কালো?
ফেললে গালে লাগবে ভালো।
বানিয়েছি যে নতুন গুড়ে, একটু না হয় মুখেই দাও।
কাটলেটে কি ঝাল লেগেছে? রাই মেখো না, অমনি খাও।

শ্যামকে বলি চা দিক তোমায় গরম-গরম আর এক কাপ,
হালুয়া টুকুন সব খাওয়া চাই—নইলে তোমাব নাইকো মাপ।
হ্যাঁ, এক কথা! শুনচি আজকে প্লাজায় হচ্চে 'লাভ প্যারেড'
যাচ্চ? সত্যি? উচিত নয়কো—কারণ তোমরা আনম্যারেড।
বউদিদিদের সঙ্গেতে নাও,
এই পয়েতেই বৌ যদি পাও!
জানোই তো ভাই আমরা হলুম প্রজাপতির আপন জাত,
খরচটা নয় দিচ্চি আমিই—ওম্‌মা! অমনি পাতছো হাত!

ননদিনী

বললেই রাগ করবে তোমরা!
নীল মিনে করা দু-ভরি ভোমর
ইয়ারিং ছিল ন-বৌয়ের কানে।
হারালো সেদিন কোথায় কে জানে!

শুনছি আবার বেড়িয়ে শালকে
মেজো-বৌ নাকি এসেছে কালকে
খুইয়ে খোঁপার সাপকাঁটাটাকে—
কথা বলবার জো তো নেই তাকে!

কেউ ভালো কিছু বললেই ডেকে
ফোঁস করবেন তিনি ঘর থেকে।
—মাথার কাঁটাটা গেল, নেই সাড়?
জানে ফের হবে—নেই কোনো চাড়।

নিত্যি গায়ের গয়না হারানো,
সোনার জিনিস ভাঙা বা সারানো
এ-কি অলক্ষ্মী ডেকে আনা নয়?
বল যদি এটা তবে দোষ হয়!

ভাববে ননদ বজ্জাত বড়—
দোষ কিছু পেলে বকতেই দড়!
যা বলি, বলি তা ভালোর জন্যে।
তোমরা না বোঝ বোঝে তা অন্যে।

পিসিমা

ষাট্! ষাট্! ষাট্!—ও কী করো বউ!
ছেলেকে বোকো না সন্ধেবেলা।
কিছুই তো আহা করেনি বাছারা
মাঠে গিয়েছিল করতে খেলা!
পোড়ারমুখো কি বলতে আছে গা?
মা ষষ্ঠী হন রুষ্টু এতে
গালাগালি দিলে—কেড়ে নেন ছেলে!
ষষ্ঠীতলায় আঁচল পেতে—

তোমাকে দিয়েচি মাদুলি, কবচ,
নিজে কাটিয়েচি মানৎ করে,
তবে না বেঁচেছে এই গুঁড়ো কটা ;
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে শিবের দোরে।
কখনো এমন মা দেখিনি বাপু!
মরা হাজা ওই তিনটে কণা,
যখন তখন যা তা গাল দেয়া!
অত ভালো নয় গিন্নিপনা!

ছোট বয়েসের কচি বুদ্ধিতে
পয়সা মায়ের বাক্স থেকে
ছেলেরা অমন নিয়েই থাকে তো—
চিরকাল ধরে আসচি দেখে!
তাই নিয়ে এত মহামারী বাপু
কেউ তো করে না তোমার মতো!
সবই বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতা কি?
তুমিই একলা সভ্য যত?
এতই কি তেজ মেয়েমানুষের?
গায়ে হাত দিলে ছেলে কি বাঁচে?
...দুলাল আমার, কক্ষনো আর
যেয়োনাকো তুমি মায়ের কাছে।
কেন চুপি-চুপি টাকা নিলি ধন?
না বলে মায়ের বাক্স খুলে,
আমার কাছেতে চাইলিনি কেন?
—কী বলবি বাবা? গেছলি ভুলে?
আবদার করে যখুনি যা চাস
তক্ষুনি তাই দিই তো তোকে!
তবুও কি তোর হয় না মানিক?
নিন্দে যে বাবা করবে লোকে!

দ্যাখো বৌ, আমি বলচি পষ্ট
সইতে কিন্তু পারিনে ওটা।
মুখ্যু-মুখ্যু করে তুমি বাপু
দুলুকে আমার দিয়ো না খোঁটা
বিদ্যে নিয়ে তো ধুয়ে খাবেনাকো
প্রাণে বাঁচাটাই সবার বাড়া ;
পড়া-পড়া করে ছেলেকে আমার,
দিনরাত তুমি দিয়ো না তাড়া।

মাসিমা

ও কে? অমিয়েশ? আয় বাবা আয়!
কেমন আছিস বল!
থাক থাক ওরে—পায়ে হাত নয়,
হয়েছে। ওপরে চল্
এতদিনে কেন আসিসনি অমু?
দেখিনি যে মাস চার।
বড় হয়ে বুঝি মাসিমাকে তোর
মনেই পড়ে না আর?
আমি তো তোদের কথা বলি প্রায়ই,
ভাবি মনে কত কী যে!
দিদি মারা গিয়ে জামাইবাবু তো
খবর নেন না নিজে!
থাকগে সে কথা। কেমন আছে রে
হাবলু, বুলটু, বিভা?
শুনলুম নাকি যাজপুর থেকে
কটকে এসেছে নিভা?
কটকে যদু কি হয়েছে বদলি?
মাইনে বারো শো হল?
আহা—হোক হোক বেঁচে থাক ওরা!
দিদিটা না দেখে মোলো।
সুহাসিনী কোথা? শ্বশুরবাড়িতে?
জামাই কেমন আছে?
চেঞ্জে গিয়েছে সিমলে পাহাড়ে?
ছোট দেওরের কাছে?
ভালোই হয়েছে, শরীরটা তার
এবার সারতে পারে।
রোগে ভুগে-ভুগে মরতে বসেছে
মেয়েটা তো একেবারে।
...ওমা! সত্যি কি? তোর সৎমার
আবার হয়েছে মেয়ে?
বড় মেয়ে তার ছোট তো আমার
কোলের খুকির চেয়ে!
তোর বাবা বাপু এ বুড়ো বয়েসে
গোলাম হয়েছে তার!

—না, না, থাক-থাক—যাসনিকো উঠে,
বলব না ওটা আর।
হ্যাঁরে অমু তুই পাটনা কলেজে
এবার পড়বি নাকি?
তা হলে তো খুবই সুবিধাই, তোকে
আমাদেরই কাছে রাখি।
তোর ছোট মেসো কত সুখ্যাতি
করে যে আমার কাছে,
বলেন—'অমুর মতন ছেলে কি
এ-দেশে কোথাও আছে?'
সব রকমেই ভালো হবে, তুই
আমার কথাটা রাখ—
ও সব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে শোন,
এখানেই এসে থাক।
কী বললি? তোর বাবার অমত?
সে ভাবে যে তাঁরি ছেলে!
পাটনায় আমি থাকতেও, ছি-ছি,
তুই যাবি হষ্টেলে?
এও কি কখনো হতে পারে হ্যাঁরে?
দিদি আজ নেই—তাই
আমরা তোদের এই অপমান
হেঁট মুখে সয়ে যাই!
তাই যাস। তোর বাবার ইচ্ছে,
আমরা তো কেউ নই!
বোনই নেই যার, বোনপোকে তার
ধরে রাখা চলে কই।
মায়েতে মাসিতে তফাৎ কি এত?
নিয়েছি যে কত কোলে।
...কাঁদব না অমু? কাঁদালি যে তুই,
আজ দিদি নেই বলে
জোর চলে গেছে তোদের উপর...?
এ যে কী দুঃখু ওরে!
মেয়েমানুষেই বোঝে শুধু তোকে
বোঝাব কেমন করে?
হোস্টেলে থেকে পড়বি তাহলে?
স্থির হয়ে গেছে তাই?
...মিছে কথা? ওরে তাই বল—শুনে
একটু আরাম পাই।

চিরদিনই তোরা সব ভাইবোন
ছোট মাসিমাকে কত
ভালো যে বাসিস তাতো আমি জানি।
নিজের মায়েরই মত।
হ্যাঁরে অমি, সেই হুগলির কথা,
সে-দিনটা মনে পড়ে?
নৌকোয় সেই ডুকরে কান্না
কাল বোশেখির ঝড়ে?
দুপুরে লুকিয়ে তুই আমি আর
সেজদি নোটন পুঁটে—
ঘুড়ি ওড়াবার সে কী ঘটা ছিল
চিলের ছাদেতে উঠে।
হাবলু তখন খুব কচি ছেলে,
বছর সাতেক তুই ;
আমার বয়েস দশ কি এগারো,
বিশুটা বছর-দুই।
সাগরেদ ছিলি তোরা তো আমার,
মনে আছে কুল চুরি?
কাঁচা আম খেতে বাগানে পালানো,
হাতে নিয়ে নুন ছুরি
ছোটবেলাকার কথা মনে হলে
এত আনন্দ হয়!
কেমন মজায় দিন যেত কেটে,
না অমু, সত্যি নয়?
রক্তের টান শক্ত এমন,
মানি-বা না-মানি ওরে—
তোদের দেখলে এত খুশি লাগে—
মন যেন ওঠে ভরে।

কাকিমা

বড়ঠাকুরের আসার সময় হল,
বড়দি, তোমার সেলাই এখন তোল।
জলখাবারের জোগাড় কিছুই নাই।

চারটে তো প্রায় বেজেই গেছে, তবু
এখনো আজ মন্টু, মানিক, নবু
ইস্কুলেতে রইল কেন ভাই?—
আমি বলি আনতে তাদের মহেশ চাকর যাক না ;
বড়দি, তোমার ভাবনা কি নেই? সেলাই এখন থাক না।

গরুর জাবের খড় কুচোনোই বেশি?
মহেশ তোমার বুদ্ধি এ কোন দেশি?
ছেলেরা আজ ফিরল না যে ঘরে!
দেরি তো নেই বাজতে পাঁচটা আর,
ঐ যে ওরাই আসছে বটে—গাইছে ছুটির গানটা,
নবুর গলার আওয়াজ ওতো, বাঁচল শুনে প্রাণটা!

মন্টুবাবু, বড্ড তুমি বোকা,
শুনলুম কাল ওদের বাড়ির খোকা
ভুলিয়ে তোমায় গেছলো নিয়ে হাটে?
আর যেয়ো না কক্ষনো ওর সাথে!
করবে খেলা সদর বাড়ির ছাতে,
উঠোন কিংবা ফুলবাগানের মাঠে।
মন্টু—মানিক, সন্ধে হল, তোমরা এসো পড়তে,
অন্ধকারে ট্রাইসিকেলে আর হবে না চড়তে।

শান্তাকে আজ দেখতে আসবে কনে!
মেজদি, তোমার কিছুই কি নেই মনে?
ধন্যি! এমন মা দেখিনি কারু।
এখন শান্তা উঠতে পারবেনাকো,
চুল সে বাঁধছে—অন্য কাউকে ডাকো ;
ময়দা বেলবে? যাক না তোমার চারু।
শান্তি, তুমি বড্ড নড়ছো, পারছিনি চুল বাঁধতে ;
মারব ঘাড়ে কিলটি এবার, বসবে তখন কাঁদতে।

দুর্গা! দুর্গা! গণেশ সিদ্ধিদাতা!
প্রজাপতির স্মরণ বিঘ্নত্রাতা,
মাকে শান্ত প্রণাম কর মা আগে।

দেখচ মেজদি, মুখের পানে চেয়ে?
কে বলবে গো শ্যামলা আমার মেয়ে?
ছিরির কাছে ফর্সা রং কি লাগে?—
আমার শানুর মতন চটক অনেক মেয়ের হয় না।
দেখলে, মনেই ধরবে সবার, না-ই পরালুম গয়না।

নব বধূ

আঃ! কী যে করো!—ভারি অসভ্য! রাস্তা ছাড়ো!
শুনচো?—ওখানে ডাকছেন মা যে 'বৌমা—' বলে।
খামোকা কেন যে গালে টোকা মার—ঘোমটা কাড়ো?
পায়ে পড়ি পথ ছেড়ে দাও—যাই ওধারে চলে।

এ কি অদ্ভুত! তবু খোঁপা নিয়ে করছ খেলা?
মাথা থেকে কেন কাঁটাগুলো খুলে পকেটে নিলে?
চুড়িতে বালাতে বাজিয়ে বাজনা—রাত্রিবেলা,
এখন এ-সব ছেড়ে দাও। উঃ! চিমটি দিলে?

চকোলেট? উঁহু, খাব না এখন, নেব না কিছু,
কানের দুলটা টেন না উহুহু—লাগছে—মবি!
চুল উশকিয়ে খোঁপা করে দিলে আলগা নিচু,
আবার এখন মাথা ঠিকঠাক কী করে করি?

..ঐ ডাকছেন মেজদিদি! শোন, পথটা ছাড়ো—
চেঁচিয়ে 'যাচ্ছি'—বলারো উপায় নেই যে মোটে?
কেন মিছে ওগো গম্ভীর মুখে মাথাটি নাড়ো?
পিসিমা কিন্তু আমার উপরে যাবেন চটে!

এ কী শত্রুতা! কী করেছি আমি তোমার? হ্যাঁ গো?—
—কান্না পাচ্ছে, পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব নাকি?
একটি চুমুর জন্যেতে এত কান্ড?—মাগো,
চোখেতে আমার জল আনতেও রাখনি বাকি!

জেঠিমা

অ—বামুন মেয়ে, সাড়ে আটটায় ছেলেদের চাই ভাত,
চটপট করে চালাও একটু হাত।
বিনু কানু ক্ষেপু গণেশের আজ এগজামিন যে আছে ;
ও লো ছেনি, জল না দিয়ে তুলসীগাছে—
সুয্যিপেনাম না করেই তুই মুখে দিলি আদা-ছোলা?
বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, এখনো এমন নোলা!

কে রে? হারু? তুই দুধে আজকাল দিচ্ছিস বড়ো জল!
'না মা' বললে তা শুনব কী করে বল্?
আমার কুড়ুনি 'মুঙলি' খালাস হবে বাদে মাস চার,
তারপরে তোর মুখ দেখব না আর।
উপিন বলেচে কলকাতা থেকে আনাবে এবার কল,
তাতে ধরা যাবে দুধে আছে কিনা জল।
শোন শোন হারু, চলে গেল? অ ঝি! ডাক তো হেরোকে ছুটে!
—আজই ওর বৌ দিয়ে যায় যেন ঘুঁটে।
সেজোবউ কোথা? ডেকে দে তো কেউ—দুধ পড়ে আছে কাঁচা
—কে? সেজোবৌমা? তোমাকে ডাকিনি বাছা!
ডেকেচি তোমার সেজো খুড়িমাকে, দুধ জ্বাল দিতে হবে।
হ্যাঁ লা পানি, তোব হবে আক্কেল কবে?
দু-মাসের ওই কচি ছেলেটাকে ঘাটে নে যেতে কি আছে?
—উপরি বাতাস কত আছে হোথা গাছে!

মেজো পুঁটিটাকে আঁতুড়ে পথ্যি দিচ্ছে কে? বামীপিসি?
এখানে রয়েচে গাওয়া-ঘির বড় শিশি!
পোয়াতি কী খাবে? চিঁড়েভাজা আর হালুয়া চা দে না খেতে।
গজা এ-বেলায় থাক দিস বিকেলেতে।
ও লো শিবি, উমা, ক্ষ্যান্ত, তোদের 'বত্ত' হল কি শেষ?
এত বেলা, বধি হয়নি এখনো? বেশ!
জেঠিমা—জেঠিমা কেন বাববার ডাকছিস আমাকেই?
মরারও আমার ফুরসুৎ মোটে নেই।
বড় বউমাকে ডাক্ না—তোদের মন্তর দেবে বলে
—এরা পারবে না কচিছেলে নিয়ে কোলে।
হ্যাঁগো নতুন-ঝি, মাছ একেবারে কবেছ্ যে কুচি কুচি—
এর চেয়ে ঢের ভালো কোটে মাছ, বুঁচি।
মুখ করিসনি, চুপ কর. তোর সব কাজই ওর মত,
রাগ আছে খালি, কাজ তো পারিস কত!
যে-দিকটা আমি না দেখব সেটি হবে ঠিক গোলমাল।
কত দিকে আর একা সামলাবো তাল?

পুরুৎমশাই এসেছেন? ও মা! মধু গেল কোথা? ডাক!
পা ধোবার গাড়ু গামছাটা দিয়ে যাক।
..হ্যাঁ বাবা, ডেকেচি। দরকার আছে, পাঁজি দেখে দিতে হবে।
আর হপ্তাতে ভালো দিন আছে কবে?

মেজ ছেলে যাবে মহালেতে কি না, চাই যাত্রার দিন।
কী রে মধু, পাঁজি এনেছিস? এই নিন।
অমাবস্যেটা লাগবে কখন, ছাড়বে কখন—তাও
—অ বড় বৌমা, কাগজেতে লিকে নাও।

জেঠিমা—জেঠিমা—ডাকচে ছেলেরা—এল বুঝি ওরা খেতে ;
ও লো বুঁচি, ঠাঁই করগে না দালানেতে।
রান্নামহলে চল্লুম আমি, খাওয়াই ওদের গিয়ে,
সিদ্ধি দইটা বউ-মা এসো গো নিয়ে।
ঠাকুরঘরের নির্মাল্যিও এনো তুমি বাছা তবে—
ছেলেদের শুভযাত্রা করাতে হবে।
এগজামিনেতে যাবে আজ ওরা, ভালোয় করুক পাশ।
ওলো ধোবা-বৌ, ও-দিকেতে কোথা যাস্?
এ-ধারেতে বোস! বলেচি, সকালে কবিসনে এসে দিক,
তবুও আসিস এই অসময়ে ঠিক।
জেঠিমা—জেঠিমা—কে ডাকে এখন—শোনার সময় নেই,
দরকার যা তা বলে যাও এখানেই!

ছেলেপুলে সব ইস্কুলে গেল। বাবুদের খাওয়া বাকি।
নিশ্বাস ফেলে এইবার দম রাখি।
ওগো বউমারা, জল খেয়েচো তো? পান সাজা শেষ হল?
নাও, এইবার কুটনোর পাট তোল।
হুগলিতে আজ তত্ত্ব যাবে যে, মাছ সন্দেশ দই।
হ্যাঁ লো ছোটবউ, লাল পেড়ে শাড়ি কই?
আলতা সিঁদুর শাড়ির সঙ্গে গোছ করে দিস দিয়ে,
বুঁচি আর মধু যাবেখন থালা নিয়ে।

কুমুদের জ্বর ছেড়েচে রে বানী ; আজকে কী খাবে? রুটি?..
সাবু খাবে আজও? তাই ভালো মোটামুটি।
গাঙুলি বাড়ির ছেলেটা ভুগচে—কাল থেকে যায় যায়!
কেউ একবার খবরটা নিযে আয়!
ও কে ও? মহেশ? কী খবর হ্যাঁ রে? চোখে কেন তোর জল?
ছেলেপুলে সব ভালো আছে তো রে বল?
..ওমা! তোর সেই লাল গাইটাও মারা গেছে কাল, সে কী?
আহা মরে যাই! অসময় তোর এ কী!
এই তো সে-দিন বাচ্চা বিয়োলো, বকনা বাছুর সাদা!
আমিই তো তার নাম দিয়েছিনু—'হাঁদা'।

—কী অসুখ তার করলো রে—গেল হঠাৎ এমন করে?
...বটগাছতলে সাপে কেটেছিল ভোরে?
হালেরও বলদ একটা না তোর গেছে মাস তিন আগে?
...সেও সাপে কেটে? এতে বড় বুকে লাগে।
কাঁদিসনি বাছা, চোখ মুছে ফেল। কী করবি আর, বল্?
আমারও যে পোড়া চোখে আসছে গা জল!
.. গোটা কুড়ি টাকা হাওলাৎ চাস? কিনবি আবার গাই?
ও-মাসে আসিস, এ মাসে তো হাতে নাই।

কর্তা আসার সময় হয়েচে। হয়ে গেচে ঢের বেলা।
এখনো না খেয়ে করছিস তোরা খেলা?
হ্যাঁ লো শিবি, উমি, রাখ না পুতুল বকবে তোদের মা যে।
ব্যস্ত রয়েচো মেয়ের বিয়ের কাজে?
আঁতুড়ের ঝিকে যেতে কে বলেচে উঠোনের মাঝ দিয়ে?
—রইল না জাতজন্ম এদের নিয়ে!
ঝিয়েদের বল, গোবরের জল দিয়ে দিক ওইখানে।
আচার-বিচার কেউ যদি এরা মানে!

কে গো? সুভির মা? এসো এসো দিদি! কোলে ও কে? ছোট মেয়ে?
উটি বুঝি ছোট তোমার নেপুর চেয়ে?
...পুজো আহ্নিক? কিছু হয়নি। এইবার ভাই যাব।
...সকাল বেলায়? সময় কখন পাব?
কচি ছেলেপুলে কিছু নেই কোলে—তবু কেন দেরি হয়?
ওই তো বলে কে? কত লোক কত কয়।
নিজের পেটেতে হয়নিকো কিছু—তাইতেই জ্বালা এই
সারাদিনে রাতে একটু সময় নেই।
জেঠিমা হয়েই মা হওয়ার সাধ মিটে গেছে ষোল আনা!
পুত্তুর শোকও বাকি নেই দিদি জানা!

তাঁতিনী

কই গো কোতায় বৌদিরা সব,
দিদিমণি কোতা গ্যালে?
উঃ কী গরম! রোদ্দুরে যেন
দেহটা ঝলসে ফ্যালে!

পথ তেতে পুড়ে হয়েচে আগুন
ফুটপাতে হাঁটা দায়!
কই গো বাছারা এসো না বেরিয়ে,
বেলা যে আমার যায়।

নতুন কাপড় এনিচি দেখসে
তোমারি মনের মতো।
কালাপানি, প্যাঁজি, আশমানি খোল
রকমারি ডুরে কত!
...পান আছে ঘরে? থাকে যদি তবে
দাও ভাই গোটা দুই,
দোক্তা? চাইনে। তামাকের পাতা
আঁচলেই আমি থুই।
দ্যাখো মেজদিদি। সোনালি মুগার
এই শাড়িখানি নিয়ো
...দাম? সে তোমার ভাবতে হবেনি
যখন সুবিধে দিয়ো
হ্যাঁ দ্যাখ বৌমা ; নতুন কাপড়
'রেখা' শাড়ি নাম এর ;
হালফ্যাশানের এ-কাপড়ে খুব
মানাবে মা তোমাদের।

এই যে আমার বড় মা এসেচো—
ছোটদিদিমুনি কই?
...ঘুমাইচে ঘরে? ডেকে তোল না গা!
বলেচে সে পইপই,
'অ—তাঁতিনী মাসি ; ফিরোজার খোলে
লাল চৌখুপি শাড়ি
কালকেই এনো, বুধবারে আমি
যাচ্চি শ্বশুর বাড়ি।'
ফরাশডাঙার কালাপাড় ধুতি
চারজোড়া আছে এই ;
সাড়ে দশ ট্যাকা কমে জোড়া মা গো
বাজারে কোতাও নেই।
...বেলেডাঙা শাড়ি? এনিচি বৈকি ;
নাল প্রেজাপতি পেড়ে।

শান্তিপুরের ধোয়া জরিপাড়
এ-শাড়িখানিও বেড়ে।
সবুজ ভোমরা পেড়ে আর এই
নাল আঁশপাড় খানা
দুই-ই একদাম। জোড়া নিলে হবে
নাচ ট্যাকা, সাত আনা।
...হাসচ দিদিরা? শ্বশুরেব নাম
নাচকড়ি কিনা—তাই
চারের পবেতে নাচ বলি আমি
প দিয়ে বলতে নাই।

সিমলের শাড়ি? ন ট্যাকার কমে
হবে না মা বলে বাখি
আমার কাছেতে দর-কষা নেই,
কথা কই পাকাপাকি।
এগারো হাতের ঝাড়া শাড়ি দ্যাখ,
মাপো হাতে বহরেতে ;
গিন্নিবান্নি তোমাকে বড়ো-মা
দিব্যি মানাবে এতে।

ন ট্যাকার শাড়ি তিন ট্যাকা দেবে?
নেবেনাকো, বলো তাই?
আমাকেই তুমি দাও না ও-দামে
আমি কিনে নিয়ে যাই।
জমি দ্যাখ দিকি কাপড়খানার?
রেশমের মতো সুতো!
আট ট্যাকা দামে পাও যদি কোথা
আমি খেয়ে যাব জুতো।
তোমারি জন্যে এনিচি এ শাড়ি,
তাই বলচি মা, শোন,
দু আনা না-হয় কম দিও—আর
কোরো না ওজোর কোন
তের সিকে দেবে? অবাক কান্ড!
এ কি হেটো শাড়ি নাকি?
কাপড়ের দাম তোমার বড়ো-মা
কিছু কি জানতে বাকি?

আচ্ছা না হয় পুরো আট টাকা
দিয়ো তুমি বাপু—হল?
মনেতে ধরেছে যখন তোমার,
ফিরে নে যাব না—তোল।
আটেতে নয়? সেই তের সিকে?
—পুরানো নেকড়া এ কি?
দর করব না। তুমি ঠি-ক করে
কত দেব বল দেখি?
সাড়ে তিন ট্যাকা? এই শেষ কথা?
ন্যায্য বলচ? হ্যাঁ মা?
ও-দামেতে শাড়ি কিনবে তোমার
রাঁধুনি বামনি ক্ষ্যামা।
সাড়ে তিন ট্যাকা দামে গিন্নি-মা
মিলের কাপড় হয়,
সরেশ জমির সিমলের শাড়ি
ও-দরের মাল নয়।

সাড়ে সাত ট্যাকা কেনা দর এর
একটু মিথ্যে নাই।
বলচি সত্যি, কালীর দিব্যি
গঙ্গার কিরে খাই।
চলে যেয়োনাকো ওগো গিন্নিমা ;
অ—বড়ো-মা ; শোন, শোন,
বউনির বেলা ফিরে তো যাবনি
বেচিনি যে এক পোনও
যা দেবে মা তুমি—তা-ই নেব আমি,
'নাচটা' ট্যাকাই দাও,
বউনি করতে যদি নোকশান
দিতে হয়—দেবো তাও।
চার ট্যাকা দেবে? ওমা! তার চেয়ে
কাটো না আমার গলা!
নোকশান করে দিচ্চি—তবুও
দয়া নেই একপলা?

একটি পয়সা লাভ রাখিনিকো।
—এ যদি মিথ্যে হয়,
চক্ষের মাথা খাই যেন আমি,
গতরে ধরবে ক্ষয়!

সওয়া চার দেবে? কাজ নেই থাক!
নেবে না, আমার জানা।
ফেরো, ফেরো অ—মা, দিয়ো সাড়ে চার,
—নে যাও কাপড়খানা।

ঠিকে-ঝি

(কাংস্য ঝংকারে)

পুড়িয়েচে হাঁড়ি কড়া ঝামাপানা করে!
ঘষে-ঘষে সেই থেকে নড়া গ্যালো ধরে।
কিচুতে ওটে না কালি—একি জ্বালাতন!
কী পাজি রাঁধুনি! আমি দেখিনি এমন!

(সমভাবে একসুরে)

রোজ-রোজ বলি ওকে ওরে বেটা উড়ে!
ঝাঁঝরা হল যে সব আঁচে পুড়ে-পুড়ে।
নতুন তিজেল তাসা ফুটো হয় যদি—
তোমার কি দায় বল? দুষী হবে সদী।

(উচ্চ সঘৃণকণ্ঠে)

ওয়্যাক! ওয়্যাক! থু-থু! ঘেন্নায় মরি
কি করে রসুই ঘর ধুয়ে সাফ করি?
গিন্নি আসুক নেমে, যাক দেখে নিজে,
নতুন বামুন তাঁর করে রাখে কি যে!

(সমান সতীব্র-স্বরে)

শিলখানা তোলেনিকো, নোড়া পড়ে আছে
আচার-বিচের ছি-ছি, কিছু যদি বাছে!
অনামুখো হতভাগা, হেঁসেলের ঘরে
এঁটো-কাটা সকড়িতে একাকার করে।

(উত্তেজিত চিৎকারে)

কি বললি? ফের শুনি—গাঁজাখোর উড়ে,
আমার গতর নেই? আমি হাড়কুঁড়ে?
যতো বড়ো মুখ নয় কথা ততো বড়ো?
টিপে-টিপে গাল দিস? কোঁদলেতে দড়ো!

(ঘন ঘন আঙুল মটকাইয়া)

তেরাত কাটে না যেন—যমে নিক টেনে,
মর-মর আবাগের পুতো কোটকেনে
গতর তুলিস! বটে! এত বড়ো মুখ?
অপ্পেয়ে অধোম্মে, ও জিভ খসুক।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে)

কেউ যেন থাকেনাকো জল দিতে মুখে,
বড়ো বাড় বাড়িয়েচো এ বাড়িতে ঢুকে!
—কে গো? দিদি? কী যে বল? সাধে দিই খোঁচা?
এ মড়া বামুন নয়, বাগদিরো ওঁচা!

(স্বর নামাইয়া)

গলা ছেড়ে গালাগাল কেন দেবেনাকো?
তোমরা দেখ না কিছু ওপরেতে থাকো
নচ্ছার বামনাটা দুটি বেলা রোজ,
আমার পেছনে লাগে—রাখ তার খোঁজ?

(আনুনাসিক স্বরে)

সত্যি যা ডেকে হেঁকে বলি বলে তাই—
দজ্জাল বজ্জাত বলে সব্বাই!
অসৈরন যে আর পারি না সইতে
কাজেই মুখটা খুলি দুকথা কইতে

(সুর টানিয়া)

বলতে গেলুম ওকে ভালো কথা ডেকে,
শিলনোড়া সকড়িতে দিসনেকো রেখে ;
গিন্নিমা দেখলে যে করবেন রাগ
রুখে উটে বলে কিনা—'চোপ মাগি, ভাগ!'

(রুখিয়া উঠিয়া)

মিছে কথা! বটে-বটে! আমি হনু নেকি?
মারবি নাকিরে তুই? কই, মার দেখি!
দ্যাখো-দ্যাখো, তোমরাই বল দিদি শুনি
মারতে এসেছে তেড়ে—বেটা উড়ে খুনে!

(সক্রন্দনে)

কলির ধর্ম এ-ই! হায়রে ভগবান!
ভালোমানুষেরি শেষে যাবে গর্দান!
আমি বেটি মনিবের করে মরি যতো—
আমাকেই বিনা দোষে হুমকানি ততো!

(চোখ মুছিতে মুছিতে)

না রাখ রেখ না, বেশ, দাও না জবাব,
থাক নিয়ে তোমাদের কটকি নবাব
ওর ভয়ে মুখ বুজে থাকবো নুকিয়ে?
এখুনি আমায় দাও পাওনা চুকিয়ে।

(গর্বিত-কণ্ঠে)

ওইতো পালেরা প্রায় রোজই সাধচেই
আমি বলি 'নাগো বাছা ফুরসৎ নেই'
ওপাড়ার ঘোষালেরা শনিবার থেকে
ত্যারো টাকা মাইনেতে পাঠিয়েচে ডেকে!

(সাহংকার তেজে)

গতর বজায় থাক ; কার ধারি ধার?
ফেলে দাও মাইনেটা—নাকে খৎ আর
ঢুকচিনি এ বাড়িতে। জবাবে কি ভয়?
কারো কথা সবে সদী—সে বাঁদিই নয়।

পূর্বরাগ

বন্ধু আছে তো কত বাইরে বা কলেজে,
বুঝি না তাদের কেন ভালোছেলে বলে যে!
ট্যালেনটেড তো কই একটিও পাইনে,
কারু সাথে তাই বড় মিশতেই চাইনে!
শোন্ বীণা, বলি আজ—কেন বিয়ে করি না?
কেন কলকাতা ছেড়ে কোনোখানে সরি না?
বোস্ তবে। সব কথা বলি সাদা গদ্যে
—বাইশ বছর এই বয়সের মধ্যে
জীবনের পথ দিয়ে এল গেল বহুজন,
কখনো তো কেউ ছুঁতে পারেনি এ দেহ মন।
আমার হৃদয় ছিল কত বেশি শক্ত
তোরা তো জানিস সবি। প্রার্থী বা ভক্ত
কাউকেই প্রশ্রয় দিইনিকো কখনই,
প্রেমে পড়বার ভাব যে করছে যখনই
তাকেই তখনি আমি বিদ্রূপে ঠাট্টায়
নাকে খৎ দিইয়েচি প্রেমিকের পাটটায়।
অমিয়বাবুর মতো দেখিনিকো কারুকে,
বলেছি সে কথা শুধু তোকে আর চারুকে।
ফেল্ যে হলাম, খালি পড়ে এই ঝোঁকেতে,
কী গভীর চাউনি সে টানা দুটি চোখেতে—
যে দেখেনি, সে কখনো বুঝবে না সে যে কী!
নইলে এ কড়া মন সহজেই ভেজে কি?
জুন মাসে ইহাদের ইস্কুলে জলসায়
প্রথম দেখেছি তাকে—রূপে চোখ ঝলসায়।
গ্রীক দেবতার মত কী সুঠাম চেহারা,
চেয়ে মুখপানে মন হল পলকে হারা!
কালো চুলে ন্যাচারাল কোঁকড়ানো কেয়ারি,
অমন গায়ের রং বাঙালির রেয়ারই।

সাড়ে পাঁচফুট হবে হাইটেতে প্রায় সে,
আসফ আলিরো চেয়ে ঢের ভালো গায় সে।
দানাদার গলা তার ক্লাসিকাল গানে ভাই,
মুক্তোর হার গাঁথে গিটকিরি তানে তাই।
হাসি তার কী সুইট স্নিগ্ধতা মাখানো
উদার নিবিড় চোখে শান্ত সে তাকানো,
আচরণ তার স্বত-অভিজাত শিষ্ট,
কথা কইবারো ধীর ভঙ্গিটি মিষ্ট!
ক্ষণেকের আলাপেই সারা প্রাণ ভরল,
বিস্মিত শ্রদ্ধায় মন নুয়ে পড়ল।
কী যে অনুভূতি সে যে খুশিতে ও লজ্জায়
অদ্ভুত শিহরণ দেহে মনে মজ্জায়—
বোঝাব কী করে বীণা! ভাষা খুঁজে পাইনে।
পারিস তো মন দিয়ে নিজে বুঝে ভাই নে!
বাদলার সেই সাঁঝে ইভাদের গাড়িতে
যেন স্বপনের ঘোরে ফিরলাম বাড়িতে।
সেই থেকে মন যেন কী রকম হয়েছে!
মনে হয়, ফাগুনের হাওয়া যেন বয়েছে
আমার ভাবনা-বনে।—যেন কার স্পর্শে
দেহ-মন চঞ্চল অজানা কী হর্ষে!

অভিসারিকা

(প্রভাতে)

পাঠিয়েছে স্লিপ ব্রতবীর আজ—'নিশ্চয় এসো সন্ধ্যারাতে
সমুদ্রতীর ধরে পশ্চিমে—স্বর্গদ্বারের শেষসীমাতে!
লোকালয় যেথা একটিও নেই, নির্জন দিক ধূ-ধূ-ধূ বালি,
দূরে—উঁচু পাড়ে জেলেদের ভাঙা কুঁড়েঘর আছে যেখানে খালি
সেইখানে আমি থাকব তোমার আসার আশায় আজকে, আশা!
ভুলো না আসতে।'
কেমনে বোঝাব মুখে তাকে আমি মনের ভাষা!
কী বেদনা নিয়ে কাটাই নীরবে, কার তরে আজ এসেছি পুরী?
সন্ধ্যা সকালে সাগরের তীরে কার লাগি আমি একলা ঘুরি?
দূর থেকে চোখে দেখার আশায় সারাটি দুপুর জানলাতলে
আরামচেয়ার নিয়ে বসে থাকি, সমুদ্র-ভিউ দেখার ছলে?

চক্রতীর্থে আমাদের বাড়ি, ব্রত নেছে বাসা স্বর্গদ্বারে,—
তবু মনে হয় ক—তো দূরে আছে,—যেন সাগরের আরেক পারে।
আমার ঘরের খুব কাছে এসে সমুদ্রতীরে রাত্রে ব্রত
বাজায় যখন বেহালাটি তার—ছড়ায় সুরের ফোয়ারা কত!
শুনে বিহ্বল বেহালায় কাঁদে বিরহী মনের বেদনা তারি,
আমারি প্রাণের দ্বারে সে পাঠায় গোপন মিনতি বারংবারই।

(দ্বিপ্রহরে)

অভিভাবিকারা মন্দিরে আজ যাবেন শুনেছি। আরতি দেখে
ফিরতে তাঁদের রাত হবে। তাই, ছোটদের যাবে বাড়িতে রেখে।
কাপড়চোপড় ঠিক করে রাখি—সন্ধ্যা হলেই বেরুব একা,
স্বর্গদ্বারের পারে, দূরে ভাঙা নৌকাটি যায় যেখানে দেখা—
সেইখানে ব্রত থাকবে লিখেছে—'বেহালার ধ্বনি শুনতে পাবে।'
আঁধারে আমাকে সে-ই সাথে করে চক্রতীর্থে পৌঁছে যাবে।

(অপরাহ্নে)

মুক্তার টাপ্ বদলিয়ে কানে নিই পরে নীল ঝুমকো দুটি,
মভ্ রং শাড়ি? না এ-খানা থাক। স্কার্লেট-ক্রেপে চুম্‌কি-বুটি
এখানিও নয়। সমুদ্রতীরে চলবার পথে পুরুষ মেয়ে
শাড়ির বাহারে নজর জড়ালে তাকিয়ে কেবলি দেখবে চেয়ে।
চেনা লোক কেউ ফেলে যদি চিনে, বাধা দেবে ডেকে পথের মাঝে।

বলবে—'ও আশা! একা যাও কোথা? কোথায় চলেছ এমন সাজে?
কেউ-বা শোনাবে—বাড়ি ফিরে যাও, রাত হল আর যেয়ো না দূরে!'
হিতার্থীদের হিতকামনায় পথ থেকে হবে আসতে ঘুরে।
তার চেয়ে এই গাঢ় নীল রং প্রিন্টেড সিল্ক শাড়িটা পরি।
অন্ধকারেতে মিশে যাবে ঠিক, কাজ নেই আজ ব্রাইট জরি!
মিষ্টি নরম প্যারিসের সেন্ট শাড়ি ও ব্লাউজে ছিটিয়ে দেব।
ফ্লাওয়ার ভাসের ফুল চুরি করে 'বোকে'ও একটি বানিয়ে নেব।
আপনার হাতে তৈরি তোড়াটি পরাবো ব্রতর বাটন হোলে,
আধফোটা এই ম্যাগনোলিয়ার কচি কুঁড়ি দেখে ভারি সে ভোলে!
দারচিনি দেয়া মিঠি পান সেজে, নেব দুটি খিলি ব্রতর তরে,
কী করে কিন্তু দেব তাকে পান? ভাবতেও ভারি লজ্জা করে।

(সন্ধ্যার পরে)

বড়ো তাড়াতাড়ি পড়েছি বেরিয়ে এখন আঁধার জমেনি ভালো,
মানুষের মুখ কাছে চেনা যায়, রয়েছে অল্প আবছা আলো।

ঘড়ির কাটার পানে চোখ মেলে অধীরে কেটেছে দিনটি সারা,
সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই মন হয়ে গেছে আত্মহারা।
আরও কত পথ বাকি আছে মাগো! দুরু-দুরু বুক ভয়েতে কাঁপে,
মুখে চোখে যেন আগুন ধরেছে আপনারি ঘনশ্বাসের তাপে।
থরথর কাঁপে সারাটি শরীর, হাত পা অবশ অসাড়পারা!
শীতেও কপালে ঘাম ফুটে গেছে। ঐ না এদিকে আসছে কারা!
—চিনে ফেলে যদি? সরে যাই দূরে। যত তাড়াতাড়ি হাঁটছি জোরে
ততো যেন চলা ফুরায় না আজ, বেড়ে গেল পথ কেমন করে?
যাঃ! ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিল গো শেমিজ শাড়ির অনেকখানি,
দুষ্টু সাগর আলতা আমার হয়তো বা মুছে নিল না জানি।
অই না শুনছি বেহালার সুর?—বুকে টিপ্-টিপ্ হল যে শুরু,
লজ্জায় ভয়ে টলছে শরীর, পারি না চলতে, কাঁপছে উরু।
ওই যে বাজছে স্পষ্ট শুনছি নটমল্লার পাগল করা,
তুমুল সাগর গর্জন ঠেলে সুরলীলা কানে দিচ্ছে ধরা।
উহু—হুহু—পায়ে ফুটে গেল কী এ! ঈশ্! রক্ত যে অঝোরে ঝরে!
ঝিনুক ভাঙা না মনসার কাঁটা? বিঁধে গেছে পায়ে এমন জোরে।
সমুদ্র থেকে কত কী যে ঢেউয়ে তীরে উঠে এসে ছড়িয়ে থাকে!
ঝরুক রক্ত!—হাটি তাড়াতাড়ি, আরেকটু গেলে পাবই তাকে!
অন্ধকারেতে ঢেকে গেছে দিক। প্রায় জনহীন তটের বালি,
ফসফরাসের আলোর ফিনকি পদতলে দীপ জ্বালায় খালি।
বাইরে মত্ত সাগরের ঢেউ আছড়িয়ে পড়ে বালুর পরে,
আমারও বুকের ভিতরে সাগর অমনি উথালি-পাথালি করে।

বাসক-সজ্জা

বিকেল হয়েছে, চুল ঠিক করে গা ধুয়ে আসব, উঠি!
আসছে সে আজ সন্ধ্যাবেলাতে, কলেজে ছুটি।
পুরো পাঁচ মাস প্রায়
এলাহাবাদেতে আসেনিকো মোটে, রয়েছে সে পাটনায়।

বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেছে শেষ, চুকেছে সকল ল্যাঠা!
তবে এখানেতে আসবার মত দিয়েছেন ওর জ্যাঠা।
শুনেছি—ধারণা তাঁর
বউমার কাছে গেলেই ভাইপো পাশ করবে না আর!

যাক! হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল বাপ! হল পরীক্ষা সারা!
পাশ করুক বা না করুক, সেটা বুঝুন এখন তাঁরা!
আমরা তো দিন কত
আনন্দে দিন কাটাই দুজনে কপোত-কপোতী মতো।

বিনুনি আজকে বিনোব না মোটে, আঁচড়িয়ে রাখি চুল ;
আলগোছে খালি এলো খোঁপা বেঁধে গুঁজব গোলাপফুল!
—মাথায় কী সেন্ট দিই?
ক্যালিফোর্নিয়া পপি তার প্রিয়, মাখি চুলে সেইটিই।

কোন সাবানের স্নিগ্ধ গন্ধ থাকে খুব বেশিখন?
দেশী না বিদেশী? দেশীর মধ্যে মন্দ না চন্দন।
জলভরা বাথ টবে
ইউ-ডি-কলোন নিই গে মিশিয়ে, গায়ে সুগন্ধ রবে!

রোজ-কোল্ড ক্রিম বিউটি-লোশনে হাত-মুখ হল মাজা!
ফেস পাউডার ফরাসি না হলে চেহারা হয় না তাজা।
জানি তার মন ভোলে—
ভালো সুর্মায় কালো সরু রেখা আঁকলে চোখের কোলে।

নিউ প্রিমরোজ পমেটম আর কসমেটিকটা কই?
গালে রুজ আর ঠোঁটে পিঙ্ক ব্লুম বুলুবো মাফিকসই!
সেন্টের স্প্রেটা আনি,
বোগ্‌দাদি এই গোলাপি আতর—সুগন্ধে রাজরানী!

আসবার প্রায় হয়েছে সময় টয়লেট শেষ করি!
জরিবুটিদার চাঁপাফুল রং ঢাকাই শাড়িটি পরি।
সিল্কের পেটিকোট
যেটা হোক হবে, রংটি কেবল হ্যাপি যেন হয় মোট!

রুপোলি জরির নীট বর্ডার শর্টস্লিভ্ দুটি হাতে,
নীল মসলিন স্প্যানিশ ব্লাউজ মানাবে শাড়ির সাথে!
শেষ হলে সাজগোজ,
—এলাচগন্ধী পানের মশলা নিয়ে আসি করে খোঁজ

ফুলদানিটিতে রেখেছি সাজিয়ে রজনীগন্ধা ফুল!
দিনেতে আজকে শোওয়া হয়নিকো এইটে হয়েছে ভুল।
রাতে যদি পায় ঘুম,
জানি সে জাগাবে চোখের পাতায় বারবার দিয়ে চুম্।

উৎকণ্ঠিতা

এখনো কেন সে এল না? বাজে যে ছটা!
মিছে আয়োজন, মিছে সাজগোজ ঘটা।
আর একবার ছাদে উঠে নয় দেখি...
পুবদিকটার গলি দিয়ে আসছে কি?
চিঠিতে লিখেছে—আসবেই ঠিক, আজ রবিবার সাঁঝে
—কেন আসছে না? হল তো সময়। ভুলে তো যায়নি কাজে?
—ওই না শুনছি রিং?
সাইকেল-বেল কানে যেন এল—টিন্‌-টিন্‌—ঠিং-ঠিং?

কত যে কষ্টে করি তার সাথে দেখা
বিধাতা জানেন, আর আমি জানি একা।
অভিভাবকেরা বারণ করেচে ডেকে—
মণীশের সাথে মিশো না এখন থেকে ;
দুজনেই বড় হয়েছ তোমরা, নয় আর ছোট তত!
বেশি মেলামেশা দেখায় না ভালো আগের দিনের মতো।
অর্থটা এর সোজা,
ভালো যে আমরা বেসেচি ক্রমশ বাইরেও গেছে বোঝা।

বড় আশা করে সারা সপ্তাহ ধরে
চেয়ে আছি পথ এই সাঁঝটির তরে!
নানা ছল করে আছি বাড়ি আজ একা!
নিষ্ঠুর মোটে দিলে না লুকিয়ে দেখা।
সদরের কড়া নাড়লে কে যেন—মনে হল। দেখে আসি।
কই? কেউ নয়, মনের ভ্রান্তি! দুঃখেও আসে হাসি।
কী ব্যথা আমার বুকে
সে যদি বুঝত, এত দূরে সরে পারত থাকতে সুখে?

ওই আসে বুঝি? চৌমাথা মোড়ে ও—ই,
—কভার প্যাকেটে হাতে কী রয়েছে? বই?
বার্নার্ড শর লেটেস্ট নাটক খানা
নিশ্চয় কিনে আনছে, আমার জানা
কোঁকড়ানো চুল, সোনালি মুগার ঢিলে পাঞ্জাবি গায়ে,
চলার ধরন ঠিক তারই মতো চঞ্চল দৃঢ় পায়ে।
—একি! এ তো নয়? ভুল!
তারি মতো জামা, তারি মতো হাঁটা, তেমনি কোঁকড়া চুল।

—কই? এখনো মিলল না দেখা মোটে
চোখে শুধু শুধু জল কেন ভরে ওঠে?
বুকের ভিতরে গুমরে কান্না কী যে!
একি অসহায় নিরুপায় আমি নিজে!
সত্যিই তবে ব্যর্থ কি এই চেয়ে থাকা পথপানে?
এল না তাহলে? সত্যি এল না? কী আওয়াজ এল কানে?
—বাইরের জানালায়
আঙুলের টোকা পড়ছে কি? না তো! হাওয়া ঠেলা মেরে যায়।

বিপ্রলব্ধা

সেতার আমার মরচেতে ছিল ভরা,
তার বদলিয়ে সুর বাঁধা হল শেষ,
বাকি ছিল শুধু পিয়ানোটা ঠিক করা,
তাও হয়ে গেচে—বাজচে এখন বেশ।
ড্রয়িং রুমের আসবাবে ছিল ধুলো
আয়না ছবিতে গিয়েছিল ঝুল ভরে ;
শোবার ঘরের স্ক্রিন কার্টেনগুলো
বদ্‌লে আবার দিয়েছি নতুন করে।
ধবধবে সাদা দুধের ফেনার মতো
বিছানা পেতেছি জোড়া খাট জুড়ে আজ,
সার্থক হবে সেলাই করেছি যত
ক্যুশনে কভারে পর্দাতে কারুকাজ।
বেডশিটে দিছি ফুল তুলে কোণে কোণে,
কেলি-কদম্ব কমল-কলির সাথে,
ড্রনথ্রেড টেনে চারপাশে জালি বুনে
—এমব্রয়ডারি করেছি নিজের হাতে।

মাথার বালিশে মরালমিথুন আঁকা,
রেশমি-তোশকে বনবসন্ত ছবি ;
—তিনটি বছর এ-দিনের আশে থাকা,
আজ চোখে তাই রঙিন ঠেকছে সবই।
শাড়িটি পরেছি যথাসম্ভব নীট,
গলায় কেবল একটি সোনার হার!

অ্যাশেস অফ রোজ বড় তাঁর ফেভারিট
আজকে মেখেচি সেই সেন্ট পাউডার।
সিলভার-গ্রেতে সোনালি জরির ফুল
এ জামা কাপড়ে কে জানে মানাল-কিনা?
বহুদিন বাদে বেঁধেচি আবার চুল—
ভালো লাগত না একটি মানুষ বিনা!
ওরিয়েন্টাল কানবালা দিছি কানে,
ইজিপশিয়ান-আর্মলেট দুটি হাতে,
মিহি রুলি বালা মিনে চুড়ি মাঝখানে,
ঝিলিগিরি-ফুল এঁটেচি খোঁপার সাথে।

রাত্রে সে যদি 'তেষ্টা পেয়েচে' বলে,
দেব জল এই রুপোর গেলাসে করে,
কেওড়া মিশিয়ে ঠান্ডা বরফ জলে
থার্মোফ্লাস্কে রাখিগে এখুনি ভরে।
মশারিতে দিছি বকুল এসেন্স ঢেলে,—
শিয়রে রেখেচি আধফোটা চাঁপাগুলি,
নীলাভ রঙের আলোর বাল্‌বটা জ্বেলে
সন্ধ্যা হতেই ফ্যানটি রেখেচি খুলি।
কেয়াখয়েরেতে নিজে মিঠেপান সেজে
ডিবেয় ভরেচি ছিটিয়ে গোলাপ জল—

—ট্রেন লেট নাকি? গেল যে আটটা বেজে!
—স্টেশন থেকে তো ফিরচে না সুবিমল!

তিনটি বছর বিলেতে কাটিয়ে আজ
ঘরের মানুষ ফিরে আসচেন ঘরে!
এবারেতে তাঁর আসুক যতই কাজ
দূরে যেতে আর দিচ্চিনে এরপরে।
যদিই বিদেশে যেতে হয় ওঁকে ফের,
বলব—আমাকে হবেই সঙ্গে নিতে।
তিনটি বছরে হয়েচি জব্দ ঢের,
বেঁচে থেকে যেন মরে আছি পৃথিবীতে।

ওরা নিয়ে গেছে মার্কেট থেকে ডালা
কনগ্র্যাচুলেট করবে স্টেশনে তাঁকে।
আপনার হাতে গাঁথছি জুঁইয়ের মালা
আমি চুপি-চুপি আড়ালেতে এই ফাঁকে।

ও—ইতো—ওই-যে—আমাদের ক্যাডিলাক
অত ধীরে গাড়ি বাড়িতে ফিরচে কেন?
মালা গাঁথা পরে সারব, এখন থাক,
কাঁপচে শরীর, লাগচে কেমন যেন।
এত আনন্দ লুকুবো কেমন করে?
ব্লাউজ শেমিজ গেল সব ঘামে ভিজে।
শোফারটা গাড়ি চালাতে পারে না জোরে,
—হয়ত তিনিই হাঁকিয়ে এলেন নিজে?
ওই—এসে গেছে! জয় ভগবান। জয়!
এইবেলা আমি লুকুই নিজের ঘরে।
প্রথম দেখাটা সবার সামনে হয়
এটা চাইনাকো, না হয় হবেই পরে।

স্টেশন থেকে কি একা এল রবি সুবি?
কে ও? ঠাকুরপো? মুখটা শুকনো কেন?
...আসেননি উনি? ব্যস্ত আছেন খুবই?
তার করেচেন ভাবিনে আমরা যেন?
বোম্বায়ে তিনি থাকবেন দিন বারো?
...কবে আসবেন জানাবেন চিঠি লিখে,
—বলা যায়নাকো, দেরি হতে পারে আরও—?
..যাচ্ছ? আচ্ছা। ডেকে দিয়ে যেয়ো ঝিকে।

—কে যায় ওখানে? মহাবীর সিং? শোন,
এখনো লাইট জ্বলে কেন সব দোরে?
হুঁশ তোমাদের কারুর নেইকো কোন,
সব আলোগুলো দাও গিয়ে অফ করে।
কারেন্ট খরচ দেখনাকো কেউ চেয়ে,
জরিমানা হলে তবে বুঝি পাবে টের!
বাবু নেই বলে আশকারা সব পেয়ে
বেজায় নবাবি বেড়ে গেছে তোমাদের।

দামি শাড়ি পরা মহা এক জ্বালাতন ;
গরমে ঘামেতে আড়ষ্ট হয়ে থাকা!
খুলে ফেলে বাঁচি কানবালা কঙ্কণ,
ফুলের মালাটা কেন যে খোঁপায় রাখা।
—কে রে? ওঃ! দাই? শোন দিকি এইধারে,
ছাদেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দে তো!

এ গরমে কেউ বিছানায় শুতে পারে?
ঘরে শুলে আজ মরে যাব গরমে তো!
কে বলেছে তোকে আনতে ও মিঠেপান?
এত রাতে পান কোনোদিন আমি খাই?
দূর করে ডিবে ফেলে দেব মেবে টান—
—যা, চলে যা। আমি নিরিবিলি শুতে চাই।

পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে আসে কানে
রবি ঠাকুরের গীতালির গানখানা,
এমন খারাপ সুর আর কথা—গানে
রবিবাবু দেন—ছিল না তো আগে জানা!
ছাদে শুয়ে থাকা এ-ও দেখি ছাই দায়,
—ভালো লাগচে না ভাবতেও কোন কিছু,
সে যদি শীঘ্র ফিরে না আসতে চায়
আমার ভাবনা কেন ঘোরে তারই পিছু!

খণ্ডিতা

বাড়ি ফিরে এলে কেন? স্টুডিওতে থাকলেই পারতে।
—ভোর হয়ে গেছে আজ 'সেটে'র শেষের কাজ সারতে?
—থাক থাক! জানা আছে। রাতভোর ছিল কাজ যেখানে,
দিনের বেলাও কেন কাটাও না সর্বদা সেখানে?

...না-না—সরো। সরে যাও, ছাড় হাত, ছুঁয়োনাকো আমাকে।
চা চাই? পারবনাকো। বলো ডেকে খানসামা রামাকে।

চুপ করো। সকালেই বাসি মুখে মিছে কথা কোয়ো না।
চরিত্র হারিয়েছ, মিথ্যেবাদীও মিছে হয়ো না।

—লজ্জা কি করছে না তারি মুখপানে চেয়ে হাসতে?
এ জীবনে একদিন সত্যিই যাকে ভালোবাসতে!

দু-চোখের কোল বসা, ঘন কালি-রেখা মুখে ফুটেছে।
ঝাঁঝালো মদের বদ গন্ধ সারাটি গায়ে ছুটেছে।
ফেঁসে গেছে পরনের দামি জরিপাড় ধুতি অতটা,
পিরানে সিঁদুর লেগে—খেয়ালও নেইকো বুঝি ততোটা!

...বাড়িয়ো না অপমান, আদরেব নাম ধরে ডেকো না ;
অধিকার হারিয়েছ, সামনে আমার আর থেকো না।
ছুঁতেও তোমাকে আজ যথার্থ ঘৃণা করি, সত্যি।
শ্রদ্ধা বা প্রেম প্রীতি নেই আর মনে এক রত্তি।

কলহান্তরিতা

অকারণে আজ মনটা উদাস, লাগছে না ভালো কিছু।
কঠিন কথায় ভেঙে দিছি বুক যার,
বলেছি—'কখনো এসো না সমুখে আর,'
বলতে পারিস শীলা!
একি বিধাতার লীলা?
অবাধ্য মন হাহাকার করে কেন ছোটে তারি পিছু?

শোন্ শীলা! মনে ছিল যে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই!
যতই কেন না বকি অভিমান ভরে,
মিটে যাবে সবি আবার একটু পরে,
তখন রাগের ঝোঁকে
'এসো না' বলচি ওকে,
ভেবেচি আবার বিকাল বেলায নিয়মিত আসবেই।

দোষ তার নয়। আমারি তো দোষ। তাই ভাবি নির্জনে।
এ তেজ দর্প এই অভিমান-ভার,
কিসের গর্বে করি এ অহংকার?
কার প্রেমে হয়ে ধনী
সবি নগণ্য গনি?
যার গরবেতে গরবিনী আমি, ব্যথা দেয়া তারি মনে!

পাষাণেরো চেয়ে কঠিন আমার এই নির্মম প্রাণ!
তা না হলে তাকে বলতে কী করে পারি,
'তোমার মমতা আমার অশুভকারী!
চাইনে ও-ভালোবাসা,
কোরো না আমার আশা,
তোমার মতন অযোগ্যে কেউ করে কি মাল্যদান?'

ছল-ছল চোখ ম্লান মুখখানি নিবিড় ব্যথায় নীল।
একটি কথারো দেয়নি জবাব কিছু!
নীরবেই ছিল বসে মাথা করে নিচু!
সারাদিন কেন জানি
তারি সেই সেই ছবিখানি
ভাসছে আমার চোখের সুমুখে, নড়চে না একতিল।

অবুঝ সে বড়, বোঝে না কিছুই, সরল শিশুরো চেয়ে!
শিবের মতন আপনা ভুলে সে থাকে,
আমি ছাড়া কেউ পারেনি চিনতে তাকে,
না থাক অর্থ ধন,
এত সুন্দর মন
নেইকো জগতে। ধন্য হয়েচি আমি, ওর মন পেয়ে।

রাগ হয়েছিল অন্যের পরে। আঘাত করেচি তাকে।
সে আঘাতব্যথা চারগুণ হয়ে কি রে
নিজেরি এ বুকে এসেছে এখন ফিরে!
সে যদি না আসে আর?
কী হবে তবে আমার?
তুই গিয়ে তাকে বলিস বুঝিয়ে যদি ব্যথা পেয়ে থাকে!

স্বাধীন-ভর্তৃকা

শুনচো রমি, এ ঘরে এসো। আমি এ ড্রেসিংরুমে।
—বাজল ছটা? না-না ও ঘড়ি কারেক্ট টাইম নয়।
কাটালে সারা দুপুর তুমি অসাড়ে, অগাধ ঘুমে,
এম্পায়ারে ডান্স্ যে আজই! কী করে যাওয়া হয়?
একটু হেল্প কর না আমায়—রম্?
ঘন্টাখানেক মাত্র আছে, সময় বেজায় কম।

কোঁকড়া চুলের ঝাঁকড়া ঠেলে চিরুনি চলেইনাকো,
ছাড়াই যত জট যে ততোই বাধছে দ্বিগুণতরো।
হাতটা আমার টাটিয়ে গেল, পিন ফিতে নাও, রাখ।
ডিসগস্‌টেড!—হেয়ারড্রেসিং যা হয় তুমিই করো!
কান্না আসে নিয়ে এ চুলের রাশ,
না হয় ক্রিম মাখিয়ে একটু কর না প্লেন ব্রাশ।

—হয়েছে। শোনো, চট করে নাও ; হওতো রেডি নিজে!
ইভনিং স্যুট? বেঙ্গলের এই হট এপ্রিল সাঁঝে?—
ধুতির চেয়ে ট্রাউজারে কি আরাম?—তুমি কী যে!
—বুদ্ধি যদি একটু থাকে! মেক হেস্ট, ছটা বাজে।
শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি, আর
উড়নি পরো সোনালি জরির ঢালাই আঁচলদার!—

লপেটা?—না, থাক। সেলিম শ্যুতেই মানাবে তোমায় ভালো,
আদ্দি জামার হাতায় তো নেই গিলের চুনোট ভরা?
লাইম জ্যুস কি চলবে? মাথায় হেয়ার লোশন্ ঢালো।
পাঞ্জাবিটাও বদলিয়ে নাও—ওটা যে ইউজ করা?
চশমা ছড়ি আংটি ঘড়ি ওই,
নাও দিকি এই সেন্টটা ঢেলে— রুমাল তোমার কই?

দ্যাখো না ডিয়ার! খোঁপাটা আমার রয়েছে টাইট কিনা?
ঘাড়ের নিচেয় আরেকটুকু পাউডার দাও ঘষে।
স্ট্রবেরি কালার সুরাটি জ্যাকেট?—সে ড্রেস্ তো করছি না?
মুক্তোর এই নেকলেসটার খিল আগে দাও কষে!
পরবো শাড়ি জাপানি, 'ক্রেপ্ ডি-শিন্',
হাঙ্গেরিয়ান্ ব্রাউজ? না থাক, ওটা কী?—হীরের পিন?

নেল পলিশিং কেসটা কোথায়?—ভ্যানিটি ব্যাগেই আছে,
লিপস্টিক যে ফুরিয়ে এল। কিনতে হবে কালই।
আইব্রাউ পেনসিলটা এনে দাও না আমায় কাছে—
উঃ! কী গরম! ফ্যানের নিচেও উঠছি ঘেমেই খালি!
বয়কে বলো—আনুক আইসক্রিম।
প্রোগ্রাম তো ওপেন হবে উইথ 'দ্য লাভার্স ড্রিম?'

শুনচ সাহেব! লেট কোরো না! ট্রিংকেট বক্স রাখ।
ব্লাউজ দিলে, পিঠের বোতাম লাগিয়ে কে দেয় বল?—
সুর্মা চোখে লাগাবে আমার?—ওই নিয়ে আজ থাকো,
মেকআপ নিয়েই টাইমওভার—আর না, এবার চলো।
—ওটা কী? খোঁপায় পরাবে রুপোর ফুল?
বড্ড বোকা হয়েচ তুমি! —দাওনি কানের দুল!

আয়না চাও তো রমি! চেন কি কে ওই মেয়ে?
মিসেস রমেন রায়কে এখন চিনতে পার? বলো?
কী হ্যাপি কাপল বলবে সবাই দেখবে যখন চেয়ে,
জেলাস হবেই ম্যারেড যারা, নয়কি?—এখন চলো।
সাজালে আমায়, চাইলে না বখশিশ?
—অনুগ্রহ দেবীর? তবে—টেক এ সুইট কিস্!

প্রোষিতভর্তৃকা

—ডাকচে বউদি? কেন? বল্‌গে যা হেনা!
মণিদি বললে—সে এখন আসবে না।
ভালো লাগে নাকো চেঁচামেচি হৈ-চৈ!
নিরিবিলি নেই কোথাও ছাদটি বই!
এখানেও দেখি পাঠিয়েচে ফের তোকে!
অন্যের মন একটু বোঝে না লোকে।
কেন ছুটে এসে করো খালি ডাকাডাকি?
চলে যাও। আমি একটু একলা থাকি!

(মনে-মনে)

ঘরে-ঘরে ওই সন্ধ্যায় শাঁখ বাজে।
কান্নার ঢেউ থামে না মনের মাঝে।
মন্দিরে যেই আরতি-বাজনা শুনি,
আরও একদিন গেল, তাই কেঁদে গুনি।
হে মধুসূদন! তোমায় স্মরণ করি।
বিদেশে সে যেন ভালো থাকে, হে শ্রীহরি!
আরও কতদিন কাটাব চোখের জলে?
সত্যি কি তাই ঘটেচে—লোকে যা বলে?

ওকে ও? বউদি? হাতে কী? চিকনি ফিতে?
এখানেও উঠে এলে চুল বেঁধে দিতে!
—থাক দিদি! মাপ চাইচি তোমার কাছে,
রুক্ষু চুলে যে বড়ো জট বেঁধে আছে!
তেল না মেখেই নেমেছি পুকুরে ভুলে।
কাল বেঁধো খোঁপা, তেল দেওয়া হলে চুলে।
বোসো না—এখন নিচেয় কী কাজ আছে?
কথা কই তবু একটু তোমার কাছে!
—কী বলচ? আমি গিয়েছি ময়লা হয়ে,
শরীরও যাচ্চে দিন-দিন যেন ক্ষয়ে?

রুগ্নের মত হয়েছে চেহারা যেন—
ডাক্তারি কোন ওষুধ খাইনে কেন?
রোগ নেই কিছু, ওষুধ খেয়ে কী হবে?
তুমি তো বৌদি আজ হেথা এলে সবে,

বহুদিন বাদে দেখচ আমাকে ভাই,
বেশি রোগা বলে হয়তো ঠেকচে তাই।
—থাকুক ও-কথা। তোমার খবর শুনি!
দাদা তো বলেন—'বৌদিটি তোর খুনী,
আমাকে মারার মতলব তার আছে।'
দ্বিতীয় পক্ষে বিরহে কি কেউ বাঁচে?

শুনবে না তুমি আমার অছিলা খালি—
দু-চোখের কোলে পড়েছে কেন এ কালি?
কী আগুনে পুড়ে দিন যে কাটাই আমি,
জানেন বিধাতা, যিনি অন্তর্যামী!
বৌদি! তোমায় সত্যি বলচি শোন,
অসুখ আমার শরীরে নেইকো কোন।
ডাক্তার এনে একটুও ফল নেই।
রোগের কারণ দেহে নয়, মনেতেই।
দুশ্চিন্তার কালরোগে ধরে যাকে
বৈদ্য কি পারে সুস্থ করতে তাকে?

'চারমাস বাদে আসবোই ফিরে' বলে,
দু-বছর হল বিলেতে গেছেন চলে।
কত চার মাস কেটে গেল বারবারই
ফিরবার কোন লক্ষণ নেই তারই।
আগে তো এখানে নিয়মিত চিঠি দিত!
প্রতি সপ্তাহে সবার খবর নিত।
ক্রমে চিঠি কমে হল মাসে একখানা!
দেশে না ফেরার অজুহাত করে নানা।
আজকাল চিঠি কমিয়ে দিয়েচে আরও ;
আমার খবর নেয় না সে একবারও!
শুনেচি ও-দেশে স্বাধীন মেয়েরা নাকি
পুরুষের সাথে করে খুব মাখামাখি।
দিনরাত আমি ভাবি শুধু আর কাঁদি
কী উপায়ে তাকে ঘরে ফিরে এনে বাঁধি?
সাগরের পারে কেন-বা দিলুম যেতে?
আর তার দেখা পাব কি এ-জন্মেতে?
কোন মায়াবিনী হয়তো পেতেছে ফাঁদই!
তাই মনে-মনে ভাবি আর শুধু কাঁদি।

মুখরা

বেশ করেচি, খুব করেচি, তোমার তাতে কি?
দেখতে তোমায় দেবই নাতো আমার হাতে কি!
মুঠোর ভিতর যাই থাক তা জানতে দেব না!
ধমকে আমায় চমকে দেবে একটু ভেব না।
বেশ করব ড্রয়ার খুলে করবো চুরি সব!
পেন, পেন্সিল, ডায়েরি, এই, ভা—রি—তো বৈভব!
বেশ করেছি, করছি চুরি পুলিশ ডাকো গে!
শাস্তি দেবীর প্রেসক্রিপসন করতে থাক গে!
ঘাঁটব আমি যখন তখন তোমার খাতা বই,
দাও না করে ডাইভোর্স কেস কিংবা তালাক-সই!
—আলবৎ! ফের বলব আবার 'বর' নয় 'বর্বর'!
যখন তখন জবর জবাব করব মুখের পর।
—ঈঃ! ভারি তো! পরম গুরু! উকারটা দাও বাদ
গরুই বটে! নইলে কি হয় গুরুর পদের সাধ?
...করবে বিয়ে আবার? উর্‌র্‌র্! করতে পার কই?
তোমার কাছে মানবো যে হার এমন মেয়েই নই।
—এভার রেডি, সতীন নিতে! আজই আন—যাও,
বরণ করে তুলতে বলো—বহুৎ রাজি তাও।
তোমার নিয়ে ঝগড়া করি একলা এখন রোজ,
দোসর পেলে বাড়বে যে জোর, তার কি রাখ খোঁজ?
দুই সতীনে দু-পাস থেকে বাক্যি-বুলেট-শেল
হানব যখন ঐ বুকেতে, হাটটি হবেই ফেল।
একটি মুখের মেশিনগানে ডাকছ ত্রাহি ডাক,
ডবল হলে তখন হুঁ হুঁ,—কাজ নেই আর, থাক!

হার মানছ?—আচ্ছা তবে নাক মলে চাও মাপ!
কবুল করো—আয় কখনও করবে না এই পাপ।
করব চুরি যা—খুশি তাই, বলবে না আর কিছু,
দেখব তোমার ড্রয়ার খুলে, লাগবে না আর পিছু?

উ—হু—মুঠোয় কি রেখেছি—দেখতে দেব না;
আদর করে ভুলিয়ে দেবে মোটেই ভেব না।
কি নিয়েছি?—হাতড়ে দেখ মের্জায়ের ঐ জেব!
—পালাই এবার, সেলাম তবে, 'পরম গুরু'-দেব!